জামাই-জাঙ্গাল

ও

অন্যান্য গল্প।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিরচিত।

চন্দননগর।

১৩১৬ সাল।

মূল্য বার আনা।

কলিকাতা।

২০১ নং কর্ণওয়ালিশষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল
লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা
প্রকাশিত।

৭০ নং কলুটোলাষ্ট্রীট হিতবাদী প্রেসে
শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বারা
মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

—*—

উৎসর্গ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত—

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী

এম্, এ; ডি, এল; ডি, এস্, সি;

এফ্, আর, এ, এস্; এফ্, আর, সি, এস্;

সি, এস্, আই।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আমি দরিদ্র সাহিত্যজীবী, সরস্বতীর দীন উপাসক। আপনি সরস্বতীর বরপুত্র, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ—স্বয়ং "সরস্বতী," সেই ভরসায় আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি শ্রদ্ধাসহকারে আপনার পুণ্যপূত নামে উৎসর্গ করিলাম। দীনের এই শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি আপনার প্রীতি সম্পাদন করিলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

বিনীত

গ্রন্থকার।

জামাই-জাঙ্গাল।

(জনপ্রবাদ-মূলক গল্প)

(১)

ত্রিবেণীর মুক্তবেণীর ঘাটের উপর প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকার পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী ও দক্ষিণদিকে সরস্বতী। অট্টালিকাটি এই দুইটি প্রবল স্রোতস্বিনীর বিয়োগস্থলে নির্ম্মিত, বিশেষ দৃঢ় এবং শ্রীহীন। উভয় নদী হইতে কেবল কতকগুলি ক্ষুদ্রায়তন কৃষ্ণবর্ণ বাতায়নশালী প্রাসাদপ্রাচীর দেখিতে পাওয়া যাইত এবং কখন কখন উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে দুই একখানি সুন্দর সুগৌর মুখকমল প্রাতরাকাশের লোহিত শোভা দর্শন করিত বা সরস্বতীর পরপারবর্ত্তী আম্র-কাননোত্থিত কোকিল-ঝঙ্কার শ্রবণ করিত।

আজ সূর্য্যগ্রহণ। ঘাটে লোকে লোকারণ্য; কাহার সাধ্য অগ্রসর হয়? স্থল হইতে আচিবুক জল পর্য্যন্ত কেবল কৃষ্ণবর্ণ মস্তক; মধ্যে মধ্যে দুই একটি বৌদ্ধের মুণ্ডিত-মস্তক।

তখনও বৌদ্ধধর্ম্ম বঙ্গদেশ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই।

জলে বিচিত্র কেতন-মাল্য-শোভিত নৌকারাজী। নৌকার পর নৌকা, নৌকার আর শেষ নাই। যেন স্থলের নরমুণ্ড ও জলের নৌকা—উভয় স্রোত আসিয়া এই ত্রিবেণী ঘাটে মিলিত হইয়াছে। প্রায় সকল নৌকা হইতেই শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর ধ্বনি হইতেছে।

এত জনতা, কিন্তু রাজবাটীর ঘাটে জনতা নাই। কালান্তক যমদূতের ন্যায় ভীষণাকার, কৃষ্ণবর্ণ, অস্ত্রধারী প্রহরিগণ রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া ঘাটের চতুর্দ্দিকের জনতা সরাইয়া দিতেছে। রাজপুরবাসিনীরা এই ঘাটে স্নান করিতেছেন। তাঁহারা স্নান সমাপন করিয়া রাজবাটী মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র প্রহরীরা জনতা ছাড়িয়া দিল। প্রবল জলস্রোতের সম্মুখে বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলে সে জল যেমন সগর্জ্জনে প্রবাহিত হইয়া থাকে, প্রহরিবর্গ অপসৃত হইবামাত্র নরপ্রবাহ সেইরূপ তেজে, সেইরূপ গর্জ্জনে ঘাট প্লাবিত করিল, তাহাতে এক ভীষণ নরসংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া কত ক্রন্দন—কত চীৎকার—কত কাতরোক্তি উত্থিত হইল!

একখানি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর নৌকায় বহুমূল্য অলঙ্কারধারিণী সম্ভ্রান্ত রমণীগণ সিক্তবস্ত্রে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা সূর্য্যগ্রহণে স্নান করিয়াছেন আবার মুক্তিতে স্নান করিবেন। সহসা তাঁহাদের নৌকার নিকট স্ত্রী-কণ্ঠের কলহ ও চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইয়া জলে স্থলে ব্রাহ্মণদিগের আবাহন মন্ত্র ও গঙ্গার স্তোত্র ভাসাইয়া দিল। উল্লিখিত নৌকা হইতে একটি স্থূলকলেবরা গৌরাঙ্গী বর্ষীয়সী গ্রীবা ঈষৎ বক্র করিয়া কলহ স্থান দেখিয়া বলিলেন,—

"আরে গেল যা! শ্যামা, এখানেও কোন্দল কর্ত্তে এসেছে নাকি? ব্যোমকেশ কোথা গেল, মাগীকে ডাকতে পাঠাও ত।"

ব্যোমকেশ বোধ হয় কর্ম্মচারীর নাম। ব্যোমকেশ অপর একজন পরিচারিকাকে বলিলেন "শ্যামাকে ডাকাও।"

সে যতক্ষণ শ্যামাকে ডাকিতে গেল, ততক্ষণ শ্যামা কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে তুলিয়া তাহার সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

শ্যামার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রথমে ধীরে ধীরে কলহ আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু সে প্রতিদ্বন্দ্বী বীরেন্দ্রাণীকে যত দুর্ব্বল মনে করিয়াছিল, সে বাস্তবিক তত দুর্ব্বল নহে, বরং তাহার অপেক্ষাও অধিক বলশালী কণ্ঠস্বর রাখে দেখিয়া, অগত্যা নিজেও সাধ্যমত বাক্যসংগ্রাম আরম্ভ করিল। সুতরাং এই দুই রমণীরত্নের কর্কশ কণ্ঠস্বরে ক্ষণেকের জন্য লোকারণ্যের অস্ফুট কোলাহল চাপা পড়িল। অকস্মাৎ ব্যোমকেশ প্রেরিত পরিচারিকার আহ্বানে শ্যামা যুদ্ধের বিনা অবসানেই ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইল। সুতরাং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকেও বিরত হইতে হইল। যদি কেহ শ্যামার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে, তাহার মুখে বাস্তবিক ক্রোধের চিহ্ন নাই বরং যেন ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসির চিহ্ন আছে।

(২)

মুসলমান রাজত্বের বহুকাল পূর্ব্বে, আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা বাস করিতেন।

তাঁহাদের রাজ্য বর্ত্তমান এক একটি জেলার অপেক্ষাও আয়তনে ক্ষুদ্র ছিল। কদাচিৎ কখন কাহারও রাজ্য বৃহত্তর হইত। তাঁহারা ধনে এখনকার জমীদারগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না; প্রায় প্রত্যেকেরই সহস্রাধিক সেনা থাকিত, সেনাদের অস্ত্র—তরবারি, বর্শা, সড়কি এবং ঢাল; কোথাও কোথাও দুই চারিটি বন্দুকের ব্যবহারও দেখা যাইত, কিন্তু সেও অপেক্ষাকৃত অধুনাতন কালে। রাজারা, কোন কারণে পরস্পরের সহিত মতান্তর হইলে, যুদ্ধ করিতেন; প্রত্যেকে ৫।৭ পাঁচ সাত শত ঢাল তরবারিওয়ালা সৈন্য লইয়া স্বয়ং অশ্বারোহণে রণস্থলে উপস্থিত হইতেন। যুদ্ধে দুই একশত লোক হতাহত হইলেও সেজন্য কাহারও নিকট রাজাদিগকে দায়ী হইতে হইত না। ফলতঃ তাঁহারা সর্ব্বাংশেই স্বাধীন ছিলেন; কেবল মধ্যে মধ্যে যখন কেহ সম্রাট বা রাজচক্রবর্ত্তী হইতেন, তখন তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া, যৎকিঞ্চিৎ রাজকর প্রদান করিতেন বা স্বীয় সেনা দিয়া সম্রাটকে যুদ্ধের সময় সাহায্য করিতেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে রাঢ় দেশে প্রায় চারি পাঁচ জন এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন। তন্মধ্যে একজন মহানাদে (মানাদে) এবং অন্য একজন ত্রিবেণীতে রাজত্ব করিতেন। ত্রিবেণীর রাজার রাজ্যও পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ব বঙ্গেই অধিক ছিল। বোধ হয়, ত্রিবেণীর রাজা গঙ্গাস্নানাদিতে আসিয়া ত্রিবেণীতে বাস করিয়াছিলেন, সেই জন্যই মহানাদের অতি নিকটবর্ত্তী হইলেও ত্রিবেণীতে আর একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন।

এই মহানাদ রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে, কিন্তু ত্রিবেণীর রাজবাটীর চিহ্নমাত্রও নাই; পুরাতন রাজবাটী ভাগীরথী ও সরস্বতীগর্ভে আত্মগোপন করিয়াছে।

(৩)

ত্রিবেণীর রাজা দিবাকর শর্ম্মা আহারে বসিয়াছেন। সম্মুখে রাজ্ঞী হৈমবতী হীরকালঙ্কার-পরিশোভিত কোমল কর-পল্লবে একখানি মূল্যবান্ রত্নখচিত তালবৃন্ত লইয়া ব্যজন করিতেছেন। রত্নখচিত তালবৃন্ত শুনিয়া কেহ হাসিবেন না। যাঁহারা এখনও তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী সিঙ্গুরের দুই তিন টাকা মূল্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালপাতার পাখা দেখিয়াছেন, তাঁহারা কতককটা বুঝিতে পারিবেন যে, এই দেশী তালপাতার পাখাই বহুমূল্য রত্নখচিত হইতে পারে।

রাজা নীরবে আহার করিতেছেন, রাজ্ঞীও নীরব। ক্ষণকাল পরে রাজা নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন,—"তুমি পরিচয় পাইলে কি করিয়া?"

"কাল স্নানের সময়ে সেই সুন্দর মেয়েটিকে দেখিয়া আমার মন বড়ই চঞ্চল হইল, ইচ্ছা হইল মেয়েটিকে কোলে করিয়া মুখচুম্বন করি। আমি দিগম্বরীকে সন্ধান লইতে পাঠাইয়া দিলাম; দিগম্বরী তাঁহাদের একজন পরিচারিকার সহিত কলহ করিয়া কথায় কথায় তাঁহাদের পরিচয় জানিয়া লইয়াছে।"

রাজা সহাস্যে বলিলেন,—"দিগম্বরীর বাহাদুরী আছে; কলহের মধ্যে পরিচয় লইল কি করিয়া?"

"দিগম্বরী আমার আদেশে পরিচয় জানিতে গিয়া প্রথমেই তাঁহাদের একটা দাসীর সহিত কোন সূত্রে কোন্দল আরম্ভ করিল। কথায় কথায় বলিল, 'জানিস্ আমি রাজবাটীর দাসী?' তখন সেই পরিচারিকা কহিল, 'আমিও রাজবাটীর দাসী। আমি মানাদের রাজবাটীতে থাকি, আ য তোকে ভয় খাব নাকি?' তাহাতেই জানিতে পারিলাম যে, তাঁহারা মহানাদের রাজ অন্তঃপুরচারিণী।"

"সে কি? মহানাদের রাজপরিবার আমার রাজ্যে আসিয়াছিলেন, আমি কোন সংবাদ পাইলাম না? তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক্ তাঁহাদের পরিচারিকার সহিত বিবাদ হইল! কাজটা ভাল হয় নাই।"

রাণী লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—"আমি ত আর মহানাদের রাণীর সহিত বিবাদ করি নাই, দাসীতে দাসীতে ওরূপ হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ তাঁহারা গুপ্তভাবে আসিয়াছিলেন, তাই আমাদিগকে কোন সংবাদ দেন নাই, দিগম্বরী বিবাদের ছলে তাঁহাদের পরিচয় লইয়াছে।"

রাজা অন্য মনে আহার করিতে করিতে বলিলেন—

"আমগুলা এখনও তেমন সুমিষ্ট হয় নাই।"

"এই সবে মাত্র বৈশাখ মাসের আরম্ভ, এখনি কি আম সুমিষ্ট হইবে? উদ্যানরক্ষক বৃক্ষের প্রথম ফল বলিয়া দেব-সেবা ও রাজ-সেবার জন্য লইয়া আসিয়াছিল, কাল দেব-সেবা হইয়াছে আর আজ—"

রাজা বাধা দিয়া বলিলেন—"আজ এই রাজসেবা হইল। মেয়েটিকি বড় সুশ্রী?"

"তা না হইলে আমি কি এত অনুরোধ করি ?"

"আচ্ছা ঘটকরাজকে আজই ডাকাইয়া পাঠাইব।"

(৪)

পর দিন প্রাতঃকালে ঘটকরাজ স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বিস্তৃত ললাট চন্দনচর্চ্চিত করিয়া ত্রিবেণীর রাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে যথাবক্তব্য বলিয়া পাথেয় দিয়া বিদায় করিলেন। ঘটকরাজ প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন, রাজসাক্ষাতে বিদায় লইয়া একেবারে মহানাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথ বড় অধিক নহে, কিন্তু সুগমও নহে, বিশেষ অমাবস্যার পর হইতে বৃষ্টি হওয়াতে পথ বড় দুর্গম হইয়াছিল। ঘটকরাজ বামহস্তে তালপত্রের ছত্র ও দক্ষিণ হস্তে একগাছি স্থূলাকার দীর্ঘ, সুপক্ব তৈলসিক্ত বংশযষ্টি লইয়া অতি সাবধানে কর্দ্দমাক্ত পথে যাইতে লাগিলেন। পথ কর্দ্দমাক্ত না হইলে তিনি দুই প্রহরের মধ্যেই মহানাদে উপস্থিত হইতে পারিতেন, কিন্তু সকর্দ্দম পথে চলা দুরূহ বলিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে মহানাদে উপস্থিত হইলেন। সে দিবসে আর রাজসাক্ষাতে না গিয়া কোন পরিচিত বন্ধুর বাটীতে রাত্রি যাপন করিলেন; ঘটকের বন্ধু কোন্ দেশে নাই ?

দিবা এক প্রহরের সময় মহানাদের রাজা পুরন্দর শর্ম্মা পুরন্দরের ন্যায় রাজসভায় বসিয়াছেন। রাজসভা একটি অতি বৃহৎ দালান। সম্মুখে নয়টি খিলান যুক্ত প্রকাণ্ড বারান্দা, পশ্চাতে অন্তঃপুর। গৃহপ্রাচীর কারুকার্য্য-

বহুল—কত ফুল, কত লতা তাহার সংখ্যা নাই। কত ফুলের ভিতর হইতে লতা বাহির হইয়াছে, আবার কত লতা গিয়া ফুলের ভিতর মিশিয়াছে। প্রাচীর এইরূপ বাহির কারুকার্য্যে ভূষিত। প্রাচীর গুলি হংসডিম্ববৎ শ্বেত ও মসৃণ। প্রাচীরে চিত্রেরও অসদ্ভাব নাই, অসংখ্য চিত্র প্রায় পরস্পরের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। অধিকাংশই দেব দেবীর চিত্র ও পৌরাণিক চিত্র, দুই একখানা অন্য চিত্রও আছে। রাজবাটীর ও একখানি প্রতিরূপ আছে। মনুষ্য মূর্ত্তি প্রায়ই নাই। কেবল একখানি চিত্রপটে একটি বৃদ্ধের শ্বেত কেশ, শ্বেত শ্মশ্রু, নয়নগোচর হইতেছে। মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন, কিন্তু ভ্রূযুগল ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ। চিত্রগুলিতে অঙ্কন-পারিপাট্য অপেক্ষা বর্ণ-পারিপাট্যই অধিক। সকল বর্ণই উজ্জ্বল।

গৃহপ্রাঙ্গণে বিস্তীর্ণ গালিচা পাতা, তদুপরি শ্বেত আস্তরণ। কর্ম্মচারিবর্গ যোগীর ন্যায় পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া নিজের নিজের কাজ করিতেছেন। অপেক্ষাকৃত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ উন্নত আসনে এবং রাজা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত আসনে মখমল মণ্ডিত উপাধানের উপর অঙ্গভার ন্যস্ত করিয়া বসিয়া আছেন। রাজার আসনের নিম্নে দুই পার্শ্বে অমাত্য ও কোষাধ্যক্ষ বসিয়া আছেন। রাজার নিকটে রাজচিহ্ন স্বরূপ একখানা বহুমূল্য তরবারি নিদ্রিত সর্পের ন্যায় শয়ান রহিয়াছে।

অমাত্য মধ্যে মধ্যে এক একখানি হরিদ্রারঞ্জিত তুলট কাগজে কি হিসাব পত্র দেখিয়া রাজাকে দিতেছেন। রাজা কোনটার অঙ্ক, কোনটার দুই চারি ছত্র পড়িয়া অমাত্যকে

প্রত্যর্পণ করিতেছেন, কোনটাতে স্বয়ং স্বাক্ষর করিতেছেন। রাজা, অমাত্য ও কোষাধ্যক্ষের মধ্যে কখন কখন দুই একটি কথা বার্ত্তা হইতেছে। অন্যান্য কর্ম্মচারী সসম্ভ্রম নীরব হইয়া বসিয়া আছেন।

রাজা অতি সুপুরুষ। রাজা হইলে সুপুরুষ হইতে হয় বলিয়াই সুপুরুষ নহেন, বাস্তবিকই সুপুরুষ। বয়ঃক্রম চত্বারিংশৎ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। অতি বলিষ্ঠ মূর্ত্তি, বীরোচিত গঠন, কিন্তু কিছু উগ্র, নিতান্ত শান্ত নহে। দেখিলে বোধ হয় রাজা সকল রিপু জয় করিয়া ক্রোধের নিকট পরাজিত হইয়াছেন। পরিধানে বারাণসী পট্টাম্বর। গ্রীষ্মকাল তাই অঙ্গে অন্য কোন আচ্ছাদন নাই, কেবল অতি সূক্ষ্ম স্বর্ণখচিত একখানা উত্তরীয়ের ভিতর দিয়া বাহুতে হীরকখচিত অনন্ত, বলয়, কণ্ঠে হীরক হার এমন কি উপবীত পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। মস্তকে নিবিড় কুঞ্চিত কেশ স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত। বদনমণ্ডলে শ্মশ্রু নাই কেবল সুসংযত গুম্ফ পৌরুষ-শ্রীকে আরও প্রস্ফুটিত করিয়াছে।

(৫)

রাজা সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ঘটকরাজ সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া উভয় বাহু উত্তোলন করিয়া বলিলেন :—

"জয়ে হস্ত নরবর পুরন্দর পুরন্দর সম বলশালী।
রঘুমণিসম প্রজাপালক ধর্ম্মে ধর্ম্মাত্মজ দানে শ্রীবলি॥"

রাজা সহাস্যে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আগচ্ছ আগচ্ছ, শুভমাগচ্ছ।"

অমাত্য নির্দ্দিষ্ট আসন দেখাইয়া দিলে ঘটকরাজ রাজ-অনুমতি লইয়া আসনে উপবেশন করিলেন। রাজা অমাত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন আর কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে কি না? অমাত্য, রাজার মন বুঝিয়া আপাততঃ কোন কার্য্যের সম্ভাবনা নাই জানাইলেন।

রাজা তখন একান্তে ঘটকের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হইলেন। প্রায় তিন চারি দণ্ড বাক্যালাপের পর ঘটকরাজ পূর্ণমনস্কাম হইয়া ও পূর্ণ মুদ্রাথলি লইয়া, আগামী আষাঢ় মাসে বর্ষার প্রারম্ভে শুভ বিবাহের দিন স্থির করিয়া প্রস্থান করিলেন; রাজাও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

রাণী রাজার নিকট, কন্যা নলিনীর বিবাহ-প্রস্তাব শুনিয়া আহ্লাদে অধীরা হইলেন, আবার কন্যার বিরহাশঙ্কায় একটু ম্লানও হইলেন। একদিনে ঘটক আসিলেন, আবার সেই দিনেই বিবাহের লগ্ন স্থির করিয়া চলিয়া গেলেন, কাজটা যেন বড়ই তাড়াতাড়ি বলিয়া বোধ হইল; কন্যার বিবাহের জন্য তাঁহারা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। কারণ, গত বৎসরে উৎকলের অন্তর্গত যাযপুরের অধীশ্বর শ্রীমান্ গজেন্দ্রমহাবীর ধরাপতি কোলাহল প্রসাদ তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া, সপ্তগ্রাম হইতে বর্দ্ধমান যাইবার পথে দুই তিন দিন পুরন্দর শর্ম্মার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। উৎকলেশ্বর মহানাদ-রাজকন্যার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া অষ্টমবর্ষীয়া বালিকাকে বিবাহ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজা পুরন্দর বড় সঙ্কটে পড়িলেন। যাযপুরেশ্বর প্রবল প্রতাপশালী. সঙ্গে প্রায় সহস্রাধিক সৈন্য আসিয়াছিল। তাঁহার খণ্ডাইৎ-দিগের তরবারির সম্মুখে

তিষ্ঠিতে পারে এরূপ বীর দক্ষিণ ভারতে বোধ হয় অল্পই ছিল। যাযপুরেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তী আর পুরন্দর যাযপুর-রাজের তুলনায় সামান্য তৃণ মাত্র। অনেক বিষয়ে এ পরিণয় মহানাদরাজের পক্ষে অনুকূল হইলেও কোলাহলের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম এবং অন্যূন বিংশতিটি অর্দ্ধাঙ্গিনী আছেন জানিয়া তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। আর এক কথা এই যে, কোথায় যাযপুর আর কোথায় মহানাদ! বোধ হয় এক মাসের পথ ব্যবধান। রাণী যখন শুনিলেন যে, যাযপুররাজ মহানাদ রাজকন্যার পাণিগ্রহণাভিলাষী, তখন আর তাঁহার ক্ষোভের সীমা রহিল না। যদি কোলাহল প্রসাদ বলপ্রয়োগে মহানাদ-রাজকন্যাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে কেহ বাধাপ্রদান করিতে পারিবে না। রাজা অবশেষে অনেক চিন্তার পর এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন, তিনি মাননীয় অতিথিকে জানাইলেন যে, কন্যার অষ্টম-বর্ষশেষে এক মহা বিপদ আছে, হয় কন্যার মৃত্যু হইবে নচেৎ কন্যা বিবাহিতা হইলে বিধবা হইবেন। যাযপুররাজ শুনিয়া বলিলেন, "ভাল, আমি তীর্থে যাইতেছি, তীর্থ ভ্রমণ পূর্ব্বক বৎসরের পরে আবার আসিয়া আপনার কন্যার পাণি-গ্রহণ করিব। চাই কি আগামী বর্ষের প্রথমে গ্রহণ উপলক্ষে ত্রিবেণীতে আসিলেও আসিতে পারি।"

রাজা ও রাণী আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু একেবারে সুস্থিরও হইতে পারিলেন না। সূর্য্যগ্রহণ হইয়া গেলে কবে কোলাহল প্রসাদ আসিয়া কন্যার পাণি-প্রার্থনা করেন, এই চিন্তাতে বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন ; এমন সময়ে আমাদের

ঘটকরাজ আসিয়া নলিনীর সম্বন্ধ স্থির করিয়া তাঁহাদিগকে এক প্রকার নিশ্চিন্ত করিলেন। ত্রিবেণীনাথ দিবাকর শর্ম্মার পঞ্চদশ-বর্ষবয়স্ক পুত্র প্রভাকর শর্ম্মার সহিত কন্যার পরিণয়ে রাজা ও রাণী সহর্ষে সম্মতি দান করিলেন।

আপনারা নায়িকার নাম জানিতে পারিয়াছেন 'নলিনী' নায়কেরও নাম শুনিলেন 'প্রভাকর' বেশ মিল হইল, না? "প্রভাকর-নলিনী" কি "নলিনী-প্রভাকর" নাম দুটিতে কিছু কবিত্ব থাকিলেও নায়ক নায়িকার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র কবিত্ব জন্মে নাই। ষোল বৎসরের চন্দ্রশেখর ও ছয় সাত বৎসরের শৈবলিনীতে ভালবাসা জন্মিয়াছিল, কেননা, উভয়ে একত্র, এক বৃন্তে দুইটি কুসুমের ন্যায় লালিত পালিত; কিন্তু আমাদের নায়ক নায়িকার মধ্যে ভালবাসা দূরে থাকুক্ চাক্ষুষ দৃষ্টির পর্য্যন্ত আদান প্রদান হয় নাই। লেখকের ইচ্ছা ছিল বটে যে, ষোড়শী নায়িকা দুর্গের ছাদের উপর একাকিনী বসিয়া হস্তে কপোল ন্যস্ত করিয়া অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া থাকিবেন, সূর্য্যের রক্তিম প্রভা আসিয়া নায়িকার আরক্তিম বদনমণ্ডলে পড়িয়া উহাকে আরও আরক্তিম করিয়া রক্তকমলের গঞ্জনাস্থল করিয়া তুলিবে, এমন সময়ে সপ্তবিংশতি-বর্ষবয়স্ক বীর নায়ক অশ্বারোহণে মৃগয়া করিতে আসিয়া দূর হইতে এই নায়িকাকে দেখিবেন, তার পর উভয়ে দৃষ্টিবিনিময়, ক্রমে ক্রমে প্রাণবিনিময়, অবশেষে নানা যুদ্ধ বিগ্রহ, মারামারি কান্না কাটনার পর মাল্যবিনিময় হইবে। আমরাও ভরসা করিয়া পাঠক পাঠিকার নিকট হইতে প্রচুর ঘটক-বিদায় প্রত্যাশা করিতে পারিব।

৬

উভয় রাজাই বিবাহের আয়োজনে ব্যাপৃত রহিলেন। উভয়েরই ইচ্ছা যে, তাঁহার ক্রিয়ার কোন অংশে যেন ত্রুটী প্রকাশ না হয়। সুতরাং কার্য্য সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহ করিবার জন্য উভয়েই বিশেষ উৎসুক। বিবাহের দিন যত নিকট হইতে লাগিল, ততই উভয় পক্ষের আগ্রহ বাড়িতে লাগিল, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম হইতে রাজকার্য্য এক রূপ স্থগিত রহিল। সকলেই বিবাহের আয়োজনে উন্মত্ত হইলেন। অবশেষে সত্য সত্যই আষাঢ় মাস আসিল, সত্য সত্যই বিবাহের দিন আসিল। ঘটকরাজ কটীতে উত্তরীয় বাঁধিয়া, মস্তকের পঞ্চ শিখা পঞ্চপুষ্পে সাজাইয়া মহা ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। শুভ মুহূর্ত্তে রাজকুমার প্রভাকর, পিতা মাতার চরণে প্রণাম করিয়া বন্ধুবর্গে পরিবৃত হইয়া, সহস্রাধিক বরযাত্রী সমভিব্যাহারে মহানাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

* * * *

সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত রাজপ্রাঙ্গণে বহুমূল্য আস্তরণ বিস্তৃত। আস্তরণের উপর স্বর্ণমণ্ডিত বরাসনে বর শ্রীপ্রভাকর শর্ম্মা উপবেশন করিয়া আছেন। চতুর্দ্দিকের আলোক-মালায় তাঁহার প্রভা যেন শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজপুত্র এক এক বার বামে বা দক্ষিণে ঈষৎ হেলিতেছেন, আর তাঁহার উষ্ণীষ হইতে, অঙ্গুরীয় হইতে, বলয় হইতে, বস্ত্র হইতে যেন শত সহস্র তারকা ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। উষ্ণীষের নিম্নদেশ হইতে কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশরাশি যেন গড়াইয়া গড়াইয়া স্কন্ধে পড়িতেছে। গৌরবর্ণ নিটোল মুখখানির

চারিদিকে কৃষ্ণকেশ,—সুন্দর মুখখানিকে আরও সুন্দর করিয়াছে।

রাজপুত্রের নিকট তাঁহার সমবয়স্ক বন্ধুবর্গ ; সকলেই সুবেশে সজ্জিত, সকলের কণ্ঠেই মাল্যদাম। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সভাস্থলে ন্যায়-বিচারে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিতে গিয়া স্বয়ং ন্যায় ও সভ্যতার সীমা অতিক্রম করিতেছেন! এক পার্শ্বে জন কয়েক শান্তমূর্ত্তি বৌদ্ধ ভিক্ষু হরিদ্র বর্ণে আচ্ছাদনে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া তালবৃন্ত হস্তে লইয়া ধীরভাবে ন্যায়ের মীমাংসা শুনিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে মুণ্ডিত মস্তক আন্দোলন করিয়া কাহারও বাক্যে সমর্থন করিতেছেন, কদাচিৎ দুই একটা কঠিন স্থানের মীমাংসা করিতেছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু যাঁহার স্বপক্ষে কথা কহিতেছেন, তিনি আনন্দে স্ফীত হইতেছেন. আর যাঁহার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিতেছেন, তিনি "নাস্তিক","বেল্লিক" "বৌদ্ধ", "পাষণ্ড" ইত্যাদি অভদ্রজনোচিত সম্ভাষণে মীমাংসার সুগম পথ অবলম্বন করিতেছেন। সভার এক প্রান্তে কয়েকটি গায়ক একজন শ্রেষ্ঠ গায়ককে ঘিরিয়া উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহার তানপুরার সহিত কণ্ঠস্বর শ্রবণ এবং মস্তক সঞ্চালনের সহিত বিকট অঙ্গভঙ্গীর শোভা সন্দর্শন করিয়া ধন্য ধন্য করিতেছেন।

শুভ লগ্নে পাত্রী পাত্রস্থ করা হইল। সকলে বলিলেন, যেন রাম-সীতার মিলন হইল, কিন্তু আলঙ্কারিকেরা আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, গৌরবর্ণ নায়ক, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামের সহিত কি প্রকারে তুলনীয় হইতে পারেন? ইহা লক্ষ্মণ উর্ম্মিলার মিলন হইয়াছে! সকলে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন।

বিবাহ শেষে ব্রাহ্মণেরা দধি, লাড্ডু, শর্করা, ক্ষীর এবং কদলী আম্র পনস প্রভৃতি ফল মূলের যথাবিধানে সংকার করিলেন। বৌদ্ধ ও শূদ্রেরা চিপিটক, পিষ্টক, নানাবিধ মিষ্টান্ন ও নানাবিধ ফল মূল উদরসাৎ করিলেন। বেশ সুশৃঙ্খলায় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বর বাসরে নীত হইলেন।

(৭)

সাত বৎসর অতীত হইয়াছে। সেই শুভ বিবাহের পর সুদীর্ঘ সাত বৎসর কালসাগরে বিলীন হইয়াছে। এখন প্রভাকর আর পঞ্চদশ বৎসরের বালক নহেন—দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবক। নলিনী আর নয় বৎসরের বালিকা নহেন—ষোড়শী যুবতী। উভয়ের রূপ যেন উথলিয়া পড়িতেছে।

এই সাত বৎসরের মধ্যে অনেক ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। আমাদের নায়ক এখন আর রাজকুমার নহেন, এখন তিনি স্বয়ং রাজা, কারণ প্রায় তিন বৎসর হইল রাজা দিবাকর শর্ম্মার লোকান্তর-প্রাপ্তি হইয়াছে। এই সাত বৎসরের মধ্যে দেশে মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধের সংখ্যা পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের অপরাহ্ণ। মধ্যাহ্নে খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রৌদ্রে বিদীর্ণ-প্রায় শুষ্ক ভূমিতে প্রায় হস্তাধিক পরিমাণ জল জমিয়াছে। মহানাদের অধিকাংশ পথেই প্রায় এক হাঁটু জল। এখনও আকাশ অন্ধকার হইয়া আছে, তবে আপাততঃ বৃষ্টি পড়িতেছে না। চতুর্দ্দিকের

জলাশয়ে অসংখ্য ভেক অশ্রান্ত চীৎকার করিয়া পর্জ্জন্য দেবের স্তুতিগান করিতেছে। রাজার ভাগিনেয় বিক্রম শর্ম্মা, রাজবাটীর সম্মুখে, বৃহৎ পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে দাঁড়াইয়া জলের প্রতি চাহিয়া আছেন। এখনও জলরাশি আসিয়া সগর্জ্জনে পুষ্করিণীর জলে পড়িয়া জলকে আবিল করিতেছে। জলের উপর শ্বেত বর্ণের ফেনরাশি ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এমন সময় বিক্রম দেখিলেন, দূরে, রাজপথে একজন লোক বৃহৎ অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজবাটী অভিমুখে আগমন করিতেছেন। অশ্বারোহীর সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত, স্থানে স্থানে সেই কর্দ্দমের ভিতর দিয়া গাত্রবস্ত্রের স্বর্ণখচিত কারুকার্য্য চিকমিক করিতেছে। বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব জলসিক্ত হইয়া যেন [illegible] বলিয়া বোধ হইতেছে। অশ্বের সর্ব্বাঙ্গ হইতে জল ঝরিতেছে।

অশ্বারোহী বিক্রম শর্ম্মার নিকটস্থ হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বিক্রমকে অভিবাদন করিলেন। বিক্রম সহাস্যে কহিলেন—

"কেও প্রভাকর? ভাই, আমি চিনিতে পারি নাই, ক্ষমা করিও। আমি তোমার আকৃতি দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, বুঝি সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিতে গিয়া স্থলে না পড়িয়া জলে পড়িয়া কাদা মাখিয়াছ।"

প্রভাকর এ পরিহাসে কিছু বিরক্ত হইলেন। তিনি অন্য সময়ে হয়ত বিরক্ত হইতেন না, কিন্তু এখন বয়োজ্যেষ্ঠ শ্যালকের নিকট হইতে সহানুভূতি না পাইয়া বড় অপ্রসন্ন হইলেন। বলিলেন—"আপনি সকলি বলিতে

পারেন। যখন ভগিনী দিয়াছেন, তখন আমাকে বানর কেন, যাহা বলিবেন, তাহাতেই সম্মত আছি। যাহাই হই না কেন, ভগিনীপতি বলিয়া ত আমার পরিচয় দিতে হইবে।"

[illegible] নাকি? আমি তামাসা করিয়া বলিয়াছিলাম; চল বস্ত্র ত্যাগ করিবে চল, কেমন করিয়া কোথায় পড়িলে? আঘাত লাগে নাই ত?"

"না লাগে নাই। যে পথ! তাহাতে আবার অকস্মাৎ বৃষ্টি আসিল, মাঠের মাঝ খানে বৃষ্টি, তাই কোথাও দাঁড়াইতে স্থান পাইলাম না।"

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে রাজবাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজার বসিবার প্রকোষ্ঠের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে বিক্রম বলিলেন,

"পথের নিন্দা কর কেন ভাই? তোমার দেশের পথ কি মহানাদের পথ অপেক্ষা ভাল?"

"আমাদের ত্রিবেণীর পথ আপনার মহানাদের পথ অপেক্ষা ভাল না হইতে পারে, কিন্তু আমার পিতা হইলে নিজের বাটী হইতে এ পর্য্যন্ত আগাগোড়া পথ বাঁধাইয়া জামাতাকে লইয়া যাইতেন।"

প্রকোষ্ঠ মধ্যে রাজা পুরন্দর শর্ম্মা বাতায়নে দাঁড়াইয়া আকাশের ভীমকান্তি দর্শন করিতেছিলেন। রাজাকে কেহ দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু জামাতার গর্ব্বিত বাক্য রাজার কাণে গেল; তিনি কিছু বলিলেন না; কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি যেন অগ্নিদেবের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে তিনি অপেক্ষাকৃত শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অমাত্যকে ডাকিয়া

পাঠাইলেন। অমাত্য আসিয়া দেখিলেন, রাজার মূর্ত্তি অতিশয় ক্রোধ-ব্যঞ্জক, কিন্তু রাজা সে ক্রোধ সম্যক্ দমন করিয়াছেন। মন্ত্রী আসিবামাত্র রাজা কহিলেন,—

"এই মুহূর্ত্ত হইতে যত শীঘ্র পার, ত্রিবেণী পর্য্যন্ত একটী পথ প্রস্তুত করিতে হইবে। কোন আপত্তি, কোন বাধা শুনিব না—যত অর্থ ব্যয় হয় হউক, তিন দিনের মধ্যে পথ প্রস্তুত করিতেই হইবে। ইহার মধ্যে হয়, ভাল।"

মন্ত্রী কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। কয়েক দণ্ড মধ্যে গ্রামবাসীরা সবিস্ময়ে দেখিল, শত সহস্র লোক কোদালি লইয়া পূর্ব্ব দিকের মাঠে ধাবিত হইতেছে। অর্দ্ধ রাত্রিতে সকলে শুনিল যে, তিন দিনের মধ্যে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত পথ প্রস্তুত করিতে হইবে, রাজার আদেশ।

সুতরাং বিক্রম শর্ম্মাও এ কথা শুনিলেন। তিনি রাজার এরূপ অসম্ভব আবদার শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। ক্ষণেক চিন্তার পর মস্তকে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িলেন; বুঝিতে পারিলেন যে, রাজপ্রকোষ্ঠের নিকট দিয়া যাইবার সময় প্রভাকর যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা রাজার কর্ণগোচর হইয়াছে, তাই বোধ হয় তিনি এই পথ নির্ম্মাণের আদেশ দিয়াছেন। বিক্রম রাজাকে চিনিতেন, তিনি বুঝিলেন যে, এই পথ নির্ম্মাণে কাহারও না কাহারও সর্ব্বনাশ হইবে।

পরদিন অপরাহ্নে মন্ত্রী আসিয়া সংবাদ দিলেন, পথ প্রস্তুত প্রায়। রাজা শুনিয়া অবিলম্বে বিক্রমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বিক্রম প্রায় সমস্ত দিনই রাজার নিকটে ছিলেন, কিন্তু ঘুণাক্ষরে রাজার অভিপ্রায় জানিতে পারেন নাই। কোন

কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইল না। বিক্রম আসিলে রাজা বিনা আড়ম্বরে একেবারে স্পষ্ট স্বরে বলিলেনঃ—

"সকলে আমার কথা শ্রবণ কর। আমার জামাতা প্রভাকর কোন বিষয়ে আমাকে তাচ্ছীল্য করিয়াছেন। আমি স্বকর্ণে—সে কথা শুনিয়াছি এবং বিক্রমেরও সে কথা অবিদিত নাই। আমি আজ তাহার প্রতিশোধ লইব। আজ চন্দ্র অস্ত যাইবা মাত্র আমি নিজ হস্তে আমার জামাতাকে এই নব নির্ম্মিত পথে বিনাশ করিব। কাহারও অনুরোধ উপরোধ মানিব না; অনেক ভাবিয়া আমি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। তবে আমি এই পর্য্যন্ত বিবেচনা করিতে পারি যে, আমি আমার জামাতার নিকট হইতে শত পদ পশ্চাতে থাকিব, ইহাতে যাহা হয় হউক।"

রাজা এই কথা বলিয়াই সহসা কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন। কাহারও কোন কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিলেন না। প্রভাকর তখন ছাদের উপর নলিনীর নিকট বসিয়া অস্ত-গমনোন্মুখ শশাঙ্কের প্রতি চাহিয়া ছিলেন।

রাজা যখন নিজের অভিমত ব্যক্ত করিলেন, তখন চন্দ্র অস্ত যাইতে আর অল্পই বিলম্ব ছিল। বিক্রম উন্মত্তের ন্যায় প্রভাকরের নিকট ছুটিলেন, ভগিনীকে অপসৃত হইবার অবসর দিবার পূর্ব্বেই বলিলেন :—

"ভাই, সর্ব্বনাশ উপস্থিত, পলাও, যত শীঘ্র পার, চলিয়া যাও। এই তরবারি লও—যাও, আর সময়—নাই।"

এই বলিয়া সংক্ষেপে, রাজার বক্তব্য প্রকাশ করিলেন। নলিনী শুনিয়া একটি অব্যক্ত ধ্বনিমাত্র উচ্চারণ করিয়া সংজ্ঞা-

হীন হইয়া গৃহতলে পতিতা হইলেন। প্রভাকর পথ নির্ম্মাণের কথা শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে রাজার এই পৈশাচিক সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে বলিলেন :—

"দিবাকর শর্ম্মার পুত্র প্রভাকর শর্ম্মা পলায়ন করিতে জানেন না। রাজা আমার নলিনীর পিতা, আমারও পিতৃস্থানীয়, তাঁহার আদেশ পালন করিব। পিতৃহত্যা করিতে নাই, নচেৎ তাঁহাকে আজ শিক্ষা দিতাম। যাহা হউক, রাজার শত পদ অগ্রে থাকিয়া রাজার আদেশে তাঁহার রাজ্য হইতে প্রস্থান করিব। চোরের ন্যায় গৃহস্বামীর অজ্ঞাতে পলায়ন করিব না, আমাদের বংশে কেহ কখনও পলায়ন করেন নাই।"

এই বলিয়া প্রভাকর মূর্চ্ছিতা নলিনীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিক্রমকে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে অনুরোধ করিয়া ছাদ হইতে অবতরণ করিলেন।

রাজবাটীর সম্মুখ লোকে লোকারণ্য। প্রভাকর স্বীয় সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ আরবী তুরগে আরোহণ করিয়া রাজবাটীর দ্বার হইতে প্রায় শতাধিক পদ দূরে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। মুখে ভয় বা চিন্তার চিহ্ন মাত্র নাই, মধ্যে মধ্যে উৎসুক নয়নে অস্তগামী চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে রাজবাটীর দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

চন্দ্রদেব ধীরে ধীরে পশ্চিম গগন প্রান্তে ঢলিয়া পড়িলেন। বিপুল জনতা, কিন্তু কাহারও মুখে শব্দ নাই—সকলে নীরব, সকলে বিস্মিত, সকলে স্তম্ভিত। এমন সময় রাজা সুন্দর শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজবাটী হইতে

নিষ্ক্রান্ত হইয়া, কাহারও কিছু বলিবার পূর্ব্বেই, উচ্চৈঃস্বরে আপনার পূর্ব্ব আদেশ জ্ঞাপন করিয়াই উন্মুক্ত অসি হস্তে জামাতার প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রভাকর পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন; তিনি কেবল বলিলেন :—

"প্রভাকর শর্ম্মা স্ত্রীলোক নহেন। কি বলিব, আপনি গুরুলোক!"

প্রভাকরের কথা শেষ হইতে না হইতেই সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, নক্ষত্র বেগে উভয় অশ্ব পূর্ব্বমুখে ছুটিতেছে। অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে অশ্ব আর দেখা যায় না, কেবল অশ্বের পদধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছে। যখন অশ্বদ্বয় নয়নপথও অশ্বের পদধ্বনি শ্রবণ-পথেরও অতীত হইল, তখন জনতা মধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। বিক্রম, অমাত্য, সেনাপতি এবং অন্যান্য রাজপরিবারবর্গ ও প্রজাবর্গ অশ্বারোহণে রাজার অনুগমন করিলেন। রাজান্তঃপুরে উত্থিত ক্রন্দন-রোলে গগন বিদীর্ণ হইল। এমন সময় ঘনকৃষ্ণ মেঘ ধীরে ধীরে পশ্চিম গগন হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। নরকের অন্ধকারের ন্যায় ভীষণ অন্ধকার, মহানাদরাজের এই পৈশাচিক ব্যবহার যেন নরচক্ষুর অন্তরালে সম্পন্ন করাইবার জন্যই সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিল। সংজ্ঞাহীনা নলিনী ছাদের উপর পড়িয়া ছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, বাহিরে ঘোর অন্ধকার। ভয়ে নয়ন মুদিত করিলেন; হৃদয়ের অভ্যন্তরে চাহিয়া দেখিলেন, সেখানেও তাই।

* * * *

ত্রিবেণীর প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চিমে, ত্রিবেণীরাজ্যের সীমার মধ্যে, প্রভাকর, শ্বশুর নির্ম্মিত নব-বয়ে অশ্বচালনা করিতে করিতে পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইলেন না, কেবল শব্দে বোধ হইল যে শ্বশুরের অশ্ব যেন অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তিনি প্রাণপণে অশ্ব চালনা করিলেন। ক্ষণ পরে আবার পশ্চাতে মুখ ফিরাইলেন, এমন সময় বিদ্যুতের আলোকে দেখিতে পাইলেন, উদ্যত কৃপাণ হস্তে তাঁহার শ্বশুর, তাঁহার নলিনীর পিতা তাঁহার পশ্চাতে; আট দশ পদ মাত্র মধ্যে ব্যবধান। প্রভাকর অকস্মাৎ স্বীয় তরবারিতে হস্তার্পণ করিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে হস্ত আকাশে উঠাইয়া বলিলেন, "আমি যদি সতীপুত্র হই, তাহা হইলে আর যেন তোমাকে অগ্রসর হইতে না হয়।"

পৃথিবী কাঁপাইয়া ভীষণ গর্জ্জনে বজ্রপাত হইল। প্রভাকরের অশ্ব চমকিত হইয়া অমিত বলে সম্মুখে লম্ফ প্রদান করিল। অল্পক্ষণ পরেই ত্রিবেণীরাজ অক্ষত শরীরে স্বীয় প্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। নলিনী তখনও ছাদে অজ্ঞান অবস্থায় শয়িতা।

পর দিন অতি প্রত্যূষে, অন্ধকার থাকিতে থাকিতে প্রভাকর আবার সেই পথে অশ্ব চালনা করিয়া মহানাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রায় দুই ক্রোশ পথ অতিবাহন করিয়া দেখিতে পাইলেন, একস্থানে নবনির্ম্মিত পথ বৃষ্টির জলে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। এ দিকে পথ, ও দিকে পথ, মধ্যে প্রায় পঁচিশ হাত পথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পরপারে কতকগুলি লোক

যেন কি দেখিতেছে। আলোক কিঞ্চিৎ স্পষ্টতর হইলে তিনি দেখিলেন যে, পরপারে বিক্রম ও [illegible] সেই ভাঙ্গনে নামিবার উপক্রম করিতেছেন। তাঁহারা প্রভাকরকে দেখিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। উভয় দিক্ হইতেই সকলে ধীরে ধীরে ভাঙ্গন মধ্যে নামিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রভাকর বিক্রমের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র বিক্রম ভগিনী-পতিকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। সকলেই প্রভাকরের সংবর্দ্ধনা করিলেন। কিন্তু রাজা কোথায়? প্রভাকর বলিলেন "রাজা কোথায়?" এতক্ষণ কেহ রাজার কথা ভাবেন নাই, সকলেই প্রভাকরের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়াই আসিয়া-ছিলেন। এখন প্রভাকরের কথায় সকলেই চমকিত হইয়া পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

এমন সময়ে একজন অমাত্য দেখিতে পাইলেন, যেখানে প্রভাকর দাঁড়াইয়া আছেন, ঠিক তাহার নিম্নে একটি প্রোথি-তাবশেষ অশ্বের কর্দ্দমাক্ত পদ বাহির হইয়া রহিয়াছে। সকলে অবিলম্বে মাটি সরাইতে লাগিলেন। সূর্য্যোদয় হইলে অনেকটা মাটি সরান হইল। অবশেষে সকলে দেখিলেন যে, অশ্বের উদরের নিম্নে, অসিহস্তে মহারাজ পুরন্দর শর্ম্মা মহানিদ্রায় নিদ্রিত। ভাঙ্গনের মাটি পড়িয়া তাঁহার অভিমান, গর্ব্ব, ক্রোধ, তেজঃ একটি নিশ্বাসের সহিত শেষ হইয়া গিয়াছে।

যে স্থানে এই রাস্তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, আজিও লোকে সেই স্থানকে "ছিনে আকনা" বলে। উক্ত স্থান মগরা ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। আর পুরন্দর

যে পথ, জামাতার প্রাণনাশের জন্য [illegible] করাইয়াছিলেন, আজিও সেই প্রাচীন পথ বিদ্যমান আছে। তাহার বর্ত্তমান নাম "**জামাই জাঙ্গাল**।"

এখনও জাঙ্গাল এবং উহার উপরের বৃক্ষশ্রেণী দেখিলে উহাকে প্রাচীন রাজপথ বলিয়া বোধ হয়। জাঙ্গালটি মহানাদ হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্তই বিস্তৃত।

আমার সন্ন্যাস।

১

শৈশবে মাতৃহীন হইয়া, জেঠাই-মার অতিরিক্ত আদরে কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলাম। আমার পিতা কলিকাতায় থাকিতেন। [illegible] কালে বাটী আসিতেন, আর সোমবার অতি প্রত্যূষে, এমন [illegible] থাকিতে কর্ম্মস্থানে প্রস্থান করিতেন। জেঠা মহাশয়কে কখনও দেখি নাই। আমার জন্মের বহুদিন পূর্ব্বে তিনি ৺ গঙ্গাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমাদের সংসারে সুতরাং বাবা, জেঠাই-মা এবং আমি এই তিনটী মাত্র লোক হইলেও, আমাদের অবস্থা ভাল ছিল বলিয়া আত্মীয় স্বজনের অভাব ছিল না।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন কলের গাড়ি হয় নাই; সুতরাং মনে করিলেই "ছয় দণ্ডে" "ছ দিনের পথ" যাওয়া যাইত না। বাবা শনিবার অপরাহ্ণে কলিকাতায় নৌকা আরোহণ করিয়া রাত্রি সাড়ে নয়টা কি দশটার সময় বাটী আসিতেন। আবার সোমবার প্রাতঃকালে অর্থাৎ রবিবার রাত্রি শেষে, এমন সময় বাটী ত্যাগ করিতেন যে, কলিকাতায় গিয়া স্নান আহার সমাপ্ত করিয়া আফিসে উপস্থিত হইতে পারিতেন। তাঁহার চাকরির প্রথমকালে তিনি পদব্রজেই কলিকাতায় যাতায়াত করিতেন। এখনকার

[illegible]—আমাদের বাটী হইতে [illegible] তের ক্রোশ পথ তখনকার লোকে গ্রাহ্য করিত না।

আমার জেঠাই-মার ভয়ে "বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত।" তিনি আমার পিতাকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। বাবা, তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করা দূরে থাকুক্, তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। এমন কি পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আমার জেঠাই-মার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিত। তাঁহার প্রকৃতি যেমন গম্ভীর ছিল, আকৃতি তেমনি জমকাল ছিল। তিন কথাতে জেঠাই-মার রূপ বর্ণনা করিতে পারা যায়। তিনি দীর্ঘ, স্থূল ও গৌরবর্ণা ছিলেন। আমার পিতার ক্ষীণ ও অপেক্ষা কৃত ক্ষুদ্র কলেবর দেখিলে বাবাকে জেঠাই-মার "কোলের ছেলে" বলিয়া মনে হইত। জেঠা মহাশয়কে জেঠাইমার কি বলিয়া মনে হইত, তাহা আমি জানি না। তবে শুনিয়াছি, তিনি বাবারই মত ছোটখাট মানুষ ছিলেন। বাবা ও জেঠাই-মা উভয়ের যত্নে ও চেষ্টায় আমাদের সংসার সুচারু-রূপে চলিত। শ্রম বিভাগ থাকিলে সকল কার্য্যই সুচারুরূপে চলিয়া থাকে; বাবা টাকা রোজগার করিতেন, আর জেঠাইমা খরচ করিতেন; অতএব নির্ব্বিবাদে দিন কাটিয়া যাইত। বাবা যখন তখন বলিতেন, "যত দিন বৌ ঠাকুরাণী আছেন, ততদিন আমি পাহাড়ের আড়ালে আছি; আমাকে সংসারের ভাবনা ভাবিতে হয় না।" জেঠাই-মার নিকট বাবা দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিলে আমার মনে হইত, বাবা বাস্তবিকই পাহাড়ের আড়ালে আছেন।

আমার [illegible] অবিবা-হিত অবস্থায় থাকা জেঠাই-মার দৃষ্টিতে সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। দক্ষিণ-পাড়ার রামলাল তর্কালঙ্কারের নয় বৎসরের কন্যা সুলোচনা আমার সহধর্ম্মিণীরূপে আমাদের সংসারে না আসাতে জেঠাই-মার বড়ই অসুবিধা বোধ হইতে লাগিল। তিনি বাবার নিকট আমার বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন, বাবাও সম্মত হইলেন, কেন না সম্মত হওয়া ভিন্ন তাঁহার আর গত্যন্তর ছিল না। জেঠাই-মার কোন ইচ্ছাই এ পর্য্যন্ত ইচ্ছাতেই শেষ হয় নাই, ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত না হইলে তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত হইতেন না। ফাল্গুন মাসে আমার বিবাহের দিন স্থির হইল। বিবাহের প্রায় এক মাস পূর্ব্ব হইতে নানা প্রকার আয়োজন হইতে লাগিল, গ্রামস্থ প্রত্যেক ব্রাহ্মণবাড়ী তৈজস, তৈল ও সন্দেশ বিতরিত হইতে লাগিল। তার পর আমার গাত্রহারিদ্রা হইল। অবশেষে নির্দ্দিষ্ট দিনে আমি বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী, বাদ্য ও আলোকমালায় পরিবৃত হইয়া বিবাহ করিতে গেলাম। জেঠাই-মা আমার বিবাহ দিয়া এক ঢিলে তিন পাখী মারিলেন :—সংসারে এক-জন সহকারী পাইলেন, বধুর মুখ দেখিয়া জীবন সার্থক করিলেন এবং অপুত্রক তর্কালঙ্কারের সমস্ত বিষয়টা আমাদের হস্তগত হইবার উপায় বিধান করিলেন।

২

জেঠাই-মা যখন আমার বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া-ছিলেন, তখন বাবাকে বলিয়াছিলেন, "তর্কালঙ্কারের মেয়ে

বড় সুলক্ষণা।” বিবাহের তিন মাস পরে অর্থাৎ বৈশাখ মাসে একটা শনিবারের অপরাহ্ণে পিতা নৌকা করিয়া বাটী আসিতেছিলেন, এমন সময় কালবৈশাখীর ঝড়ে নৌকা উল্টাইয়া তাঁহার সশরীরে ৺ গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল। এই প্রথম লক্ষণ দেখিয়া আত্মীয় ও প্রতিবেশী সকলেই নববধূকে অলক্ষণা বলিয়া স্থির করিলেন কিন্তু জেঠাই-মা যখন একবার সুলোচনাকে সুলক্ষণা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আর কিছুতেই তিনি তাহাকে “অপয়া বা “অলক্ষণা” বলিতে প্রস্তুত নহেন। প্রতিবেশিনীরা যে পরিমাণে বালিকাকে ঘৃণার্হ মনে করিত, জেঠাই-মা, তাঁহার জেদ বজায় রাখিবার জন্য বালিকাকে সেই পরিমাণে স্নেহ করিতেন। জেঠাই-মার ভয়ে কেহ আর তাহার প্রতিবাদ করিত না।

পিতার অকস্মাৎ মৃত্যুতে আমাদের সংসারমধ্যে একটা ভয়ানক বিপদের ছায়া পতিত হইল। বিশেষতঃ আমার জীবন যেন একেবারে শূন্য হইয়া পড়িল। জেঠাই-মা নানা প্রকারে আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। এই প্রকারে শোকে দুঃখে, শান্তি অশান্তিতে দেখিতে দেখিতে ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। সুলোচনা নয় হইতে পনের এবং আমি সতের হইতে তেইশ বৎসরে উপনীত হইলাম। ক্রমে ক্রমে পিতৃ শোক ভুলিয়া গেলাম। আমাদের যে সকল স্থিধন সম্পত্তি ছিল, তাহার আয় হইতে বেশ সচ্ছলরূপে সংসার চলিতে লাগিল। আমাকে আর চাকরি করিতে হইল না। একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, পিতা বিদেশে থাকিতেন এবং আমি জেঠাই-মার নিকটে বাটীতে থাকিতাম,

কিন্তু আমার বিদ্যাভ্যাসে কখনও শৈথিল্য হয় নাই। এমন কি, পিতার মৃত্যুর পরও আমার বিদ্যা শিক্ষা সমভাবে চলিতে লাগিল। তেইশ বৎসর বয়সে আমি বেশ সংস্কৃত, পারসি ও ইংরাজি শিখিয়াছিলাম। সংসারের ভাবনা ভাবিতে হইত না, জেঠাই মা ছিলেন; অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন ছিল না, পৈত্রিক বিষয় ছিল; সুতরাং আমার বিদ্যাশিক্ষার কোনও ব্যাঘাত হইল না। অধিকন্তু আমি জেঠাই-মার প্রতিবন্ধকতা সত্বেও সুলোচনাকেও রীতিমত লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলাম। জেঠাই-মা প্রথম প্রথম আপত্তি করিলেন, তার পর যখন দেখিলেন যে, সুলোচনা বিচালির হিসাব, কলুর হিসাব, মুদীর হিসাব পরীক্ষা করিতে শিখিয়াছে, তখন তিনি বধুকে লেখা পড়া শিখিতে উৎসাহ দিতেন। সুলোচনার মুখে রামায়ণ মহাভারত শুনিতে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন। তখন বঙ্কিম বাবুর "দেবী চৌধুরাণী" অথবা "আনন্দ মঠ" বাহির হয় নাই, হইলে সুলোচনাকে লাঠি খেলা, তরবারি খেলা, ঘোড়ায় চড়া, মল্লযুদ্ধ শিখাইতাম কি না জানি না; কিন্তু আমি বেশ কুস্তি করিতে ও লাঠি খেলিতে জানিতাম। সুলোচনা শুভঙ্করী হিসাবে সকল প্রকার আবশ্যক অঙ্ক কষিতে পারিত। রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, কবিকঙ্কণ চণ্ডী এবং তৎকাল প্রচলিত অনেক বাঙ্গলা পুস্তক পড়িয়াছিল এবং তাহার জন্য আমাদের সেকালের শ্রেষ্ঠ লেখক ঈশ্বর গুপ্তের "প্রভাকর" পত্রিকার গ্রাহক হইয়াছিলাম। তাহাকে ইংরাজী ও সংস্কৃত শিখাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আর কার্য্যে পরিণত করিবার

অবক… …ই… না। বিবাহের ঠিক ছয় বৎসর পরে যে ফাল্গুন মাসে সুলোচনাকে পাইয়াছিলাম, সেই ফাল্গুন মাসেই—বলিতে বুক ফাটিয়া যায়—সুলোচনাকে হারাইলাম। সর্পাঘাতে সুলোচনা আমাদের কাঁদাইয়া চিরদিনের তরে চলিয়া গেল।

(৩)

পিতার মৃত্যুতে জীবন শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। এখন আবার সুলোচনার মৃত্যুতে জীবন বিষ বোধ হইতে লাগিল। জেঠাই-মা এবারে বড়ই অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যার সময় তাঁহার সেই গগনভেদী শোকোচ্ছ্বাস, আমার শয়ন কক্ষে সুলোচনার হাতের কত কারুকার্য্য, সেই মহাভারত রামায়ণ, সেই কড়ির আলনা, কড়ির শিকা, আমাকে একেবারে পাগল করিয়া তুলিত। ইচ্ছা হইত, বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও চলিয়া যাই, কিন্তু আমি বাড়ী ছাড়িয়া যাইব কি, জেঠাই-মা আমাকে চক্ষের অন্তরাল করিতেন না। আমিও বুঝিতে পারিতাম আমাকে না দেখিলে তিনি বড়ই কাতর হইতেন। সেইজন্য হৃদয়ের আগুণ হৃদয়ে চাপিয়া সতত সেই মাতৃস্বরূপিণী জেঠাই-মার কাছে কাছে থাকিতাম। আমি বরং লেখা পড়া লইয়া অনেকটা সময় কাটাইয়া দিতাম। কিন্তু তিনি একাকিনী বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন।

সুলোচনা তাঁহার জীবনের, হৃদয়ের, কাজ কর্ম্মের অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল। জেঠাই-মার নিজের অনেক কাজ কর্ম্ম সুলোচনা দ্বারা সম্পাদিত হইত। জেঠাই-মা ইদানীং কেবল হরিনামের মালা লইয়া বসিয়া

থাকিতেন, আর সুলোচনাকে ফরমাইস করিতেন। এই প্রকার অনেক গুলা কার্য্য তাঁহার হস্তচ্যুত হওয়াতে সে গুলা জেঠাই-মার অনভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এখন আবার বহুদিন পরে সেই সকল কার্য্য করিতে গিয়া তিনি নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন। কাজ করিতে তিনি থত মত খাইয়া এক একটি সুদীর্ঘ তপ্তশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রাণের যাতনা ব্যক্ত করিতেন। বয়সও অধিক হওয়াতে সংসারিক কাজ কর্ম্ম আর বড় করিতে পারিতেন না। এরূপ স্থলে বাঙ্গালীর গৃহে যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইল। ভাবরাজ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বাস করিলেও সংসারকে একেবারে ছাঁটিয়া ফেলা যায় না; বিশেষতঃ যখন গুরুজন মাথার উপর থাকেন। অচল সংসারকে সচল করিবার জন্য আবার জেঠাই-মা উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন; ও পর বৎসর শ্রাবণ মাসে একটি "বাড়ন্ত" মেয়ে রাঙ্গা চেলি পরিয়া আমাদের বাটীতে আসিয়া জেঠাইমাকে প্রণাম করিয়া আমার শয়ন কক্ষে সুলোচনার পরিত্যক্ত সেই শয্যা অধিকার করিল। আমার বিবাহ হইল বটে কিন্তু এ বিবাহ যেন বিবাহ বলিয়াই মনে হইল না। কেবল জেঠাই-মার মনস্তুষ্টির জন্য বিবাহ করিলাম। এ বিবাহে আমাদের পক্ষে যে পরিমাণে আনন্দের অভাব ছিল, কন্যা পক্ষ সেই পরিমাণে অধিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া শুভ কার্য্যকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তুলিলেন। বাসরে আমি একেবারে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়াছিলাম।

পুরাঙ্গনাগণের শত সহস্র তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ ও তদপেক্ষাও তীক্ষ্ণতর কটাক্ষবাণে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একটি সুন্দর চির-

পরিচিত মুখ ভাবিতেছিলাম। এবারে আর আমাদের গ্রামের অধ্যাপক গৃহে বিবাহ করি নাই। কলিকাতায় সভ্য ভব্য চাকুরে বাবুর বাটীতে বিবাহ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে সময়েও কলিকাতার কুল-লক্ষ্মীগণের মধ্যে লেখা পড়ার যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল না।

তথাপি নব বধূর একজন আত্মীয় আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন, "আহা! কুসুম আমাদের এত নেকা পড়া শিকে শেষে কিনা একজন পাড়াগেঁয়ে বোবার হাতে পড়্‌ল?" যে সহুরে মহিলা আমার প্রতি এই সুমধুর বচন প্রয়োগ করিলেন, তাঁহার নিজের কথার তখনও আড় ভাঙ্গে নাই। তাঁহার উচ্চারণে রাঢ় দেশের টান যথেষ্ট ছিল। বিবাহের পর একদিন শুনিলাম যে আমার নব পত্নীর মাতুলালয় রাঢ় দেশে; কিন্তু রাঢ় দেশ কোথায়, তাহা শুনি নাই, শুনিবার ইচ্ছাও হয় নাই। বলিতে কি, এই দ্বিতীয় বারের বিবাহে আমি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলাম। সেই বিবাহরাত্রি ভিন্ন আর কখনও শ্বশুরালয়ে যাই নাই, সুতরাং তাঁহাদের বাটীর কাহাকেও চিনিতাম না।

আমার নব পত্নী কুসুমকুমারী বিবাহের অল্প দিন পরেই দ্বিরাগমন করিয়া আমাদের বাটীতেই বাস করিতেছিল। অগত্যা আমার সহিত কতকটা আলাপ পরিচয় হইয়াছিল বই কি? আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিতাম যে, সে সাধ্যমত সুলোচনার স্থান অধিকার করিতে চেষ্টা করিত; কিন্তু সুলোচনা আর কুসুমকুমারী! আকাশ পাতাল প্রভেদ। সুলোচনাকে আমি নিজে লেখা পড়া শিখাইয়া আমার মনের মত করিয়া তুলিয়াছিলাম, আর কুসুমকে অন্য লোকে, তাহার আত্মীয়

স্বজন, কি জানি কাহার জন্য গড়িয়া তুলিতেছিলেন। জেঠাই-মা গৃহকার্য্যে তাহাকে অনেকটা নিজের মত করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু আমি কিছুতেই তাহা পারিলাম না। অপরাধ তাহার নহে, আমার, কেননা আমি তাহাকে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দিতাম না। বুঝিতাম, তাহার অপরাধ নাই। তথাপি সুলোচনার মৃত্যুর পর এক বৎসর যাইতে না যাইতে যে অপরে আসিয়া তাহার পরিত্যক্ত শূন্য হৃদয় অধিকার করিবে, তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না।

(৪)

শ্রাবণ মাসে বিবাহ হয় আশ্বিন মাসে কুসুমের দ্বিরাগমন হইয়াছিল। মাঘমাস পর্য্যন্ত সে আমাদের বাটীতে থাকিয়া আবার কলিকাতায় গেল। ফাল্গুন মাসে এক দিন জেঠাই-মা আমাকে বলিলেন, "বেহান পত্র দিয়াছেন, বৌ-মাকে নিয়ে তিনি একবার বাপের বাড়ী যেতে চান। তাই আমার মত চেয়েছেন। কি বলা যায়?" আমি অন্যমনস্কভাবে বলিলাম, "নিয়ে যেতে চান, বেশত, ক্ষতি কি?" মনে মনে ভাবিলাম, কুসুম মামার বাড়ী যাবে, তা আমার মতামতের প্রয়োজন কি?

ফাল্গুন মাসের শেষে আমার মন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। কোনও ক্রমে আর বাড়িতে থাকিতে পারিলাম না। অবশেষে একদিন জেঠাই-মাকে বলিলাম, বাবার এবং জেঠা মহাশয়ের পিণ্ডদান করিতে গয়ায় যাইব। বাবার ও বড় বৌয়ের (সুলোচনার) অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছে;

তাঁহাদের শ্রাদ্ধ হয় নাই। যতদিন প্রেতশিলায় তাঁহাদের পিণ্ড দিতে না পারিতেছি, ততদিন কিছুতেই মনে শান্তি পাইতেছি না; ইত্যাদি, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে প্রথমে জেঠাই মা কিছুতেই রাজী হন নাই। তার পরে অনেক তর্কবিতর্কের পর আমার জেদই বজায় রহিল। জেঠাই মা বলিলেন, "যদি নিতান্ত যাইতে হয়, তাহা হইলে আমিও সঙ্গে যাইব। আর একজন চাকর, একজন দাসী ও একজন রাঁধিবার লোকও আবশ্যক।" আমার ইচ্ছা ছিল না যে কেহ আমার সঙ্গে যায়। বলিতে কি, আমার মনে মনে সঙ্কল্প ছিল যে, দিন কতক সন্ন্যাসিবেশে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইব। জেঠাই-মা, দাস দাসী ও পাচক পাচিকা সঙ্গে যাইলে সে সঙ্কল্প ব্যর্থ হইবে। সেই জন্য দুই চারি দিন নানা প্রকার মান অভিমান, আদর আবদারের পর জেঠাই-মা আমাকে একাকী যাইতে দিতে অগত্যা সম্মত হইলেন। ফাল্গুন মাসের ২৮ শে কি ২৯ শে আমি যাত্রা করিলাম।

গয়া যাইবার ইচ্ছা যে প্রবল হইয়াছিল, তাহা নহে। তবে গয়ার নাম না করিলে জেঠাই-মার সম্মতি পাওয়া দুষ্কর হইত। কোনও বিশেষ তীর্থ স্থানে যাইতেও আমার বড় অভিরুচি ছিল না। বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া বেড়াইব, নানা দেশের আচার ব্যবহার দেখিব, এই উদ্দেশ্যে বাটী হইতে বাহির হইলাম। সে সময় হাওড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রথম কলের গাড়ির রাস্তা খোলা হইয়াছিল, কিন্তু রেলপথে যাত্রা না করিয়া পদব্রজে দুই দিন পরে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলাম। "বর্দ্ধমানের

রাঙা মাটি” আমার পরিধেয় বস্ত্রকে একেবারে লালে লাল করিয়াছিল। এই লাল কাপড় দেখিয়া আমার মাথায় একটা মতলব আসিল। আমি বর্দ্ধমানে আমার কাপড় জামা চাদর সমস্তই গৈরিকরঞ্জিত করিয়া লইলাম। তিন চারি দিন বর্দ্ধমানে বিশ্রাম করিয়া বিষ্ণুপুর অভিমুখে গমন করিলাম।

এইবারে আমি বুঝিতে পারিলাম যে ক্রমে ক্রমে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতেছি। মাটির সহিত কাঁকরের অংশ অধিকতর পরিমাণে মিশ্রিত দেখিতে লাগিলাম। এতদিন নিম্নবঙ্গের সমতল ভূমি অতিক্রম করিতেছিলাম। এইবার কখনও উচ্চে উঠিতে লাগিলাম, কখনও বা নিম্নে নামিতে লাগিলাম। এই সকল ভূমি সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় উচ্চাবচ। পথের ধারে বনে অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। পরে জানিতে পারিলাম যে, তার মধ্যে অনেকগুলি শাল গাছ আছে। দেশে শাল পাতা অনেক দেখিয়াছি, শালকাঠও দেখিয়াছিলাম, কিন্তু আস্ত শালগাছ কখনও দেখি নাই। সেইজন্য অবাক্ হইয়া সেই সকল গগনস্পর্শী বৃহৎ বৃক্ষের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। পথের ধারে বিশ পঁচিশ খানা তৃণাচ্ছাদিত কুটীর দেখিলাম। কুটীরের নিকট নগ্নকায়, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, অসভ্য, সরল সাঁওতাল বালক বালিকা-গণ মহিষ ও মহিষশাবক লইয়া ইতস্ততঃ চরাইয়া বেড়াইতেছে। সাঁওতাল রমণীরা কুটীর দ্বারে বসিয়া নামমাত্র বস্ত্রে লজ্জা রক্ষা করিয়া, কেহবা ঝুড়ি, ধুচুনি ও কেহবা খেজুর পাতার চাটাই বুনিতেছে। পুরুষেরা দূরে মাঠে কাজ করিতেছে।

তাহারা যখন পরস্পর কথা বার্ত্তা কহে তখন তাহাদের ভাষা কিছুমাত্র বুঝিতে পারি না; আর আমার প্রশ্নের জবাব দিবার সময় অদ্ভুত রকমের বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করে।

দুই তিন দিন পরে আমি বর্দ্ধমানের সীমা পার হইয়া বাঁকুড়ায় প্রবেশ করিলাম। এখানকার দৃশ্য বড় চমৎকার। যখন কোন ডাঙ্গা বা উচ্চ ভূমির উপর উঠি, তখন চারিদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাই, খুব দূরে দিগন্তের কোলে ধূম্রবর্ণ মেঘের ন্যায় পর্ব্বতমালা দেখিতে পাই, আবার নিম্নস্থানে উপস্থিত হইলে সে সকল কিছুই দেখিতে পাই না। নিকট-বর্ত্তী বন জঙ্গল আমাকে বাহিরের জগৎ হইতে যেন বিচ্ছিন্ন করিয়া হৃদয় মধ্যে লুকাইয়া রাখে। অনেক স্থলে সাধারণ উচ্চ স্থান গুলি উদ্ভিদশূন্য; তৃণগুল্মের নাম পর্য্যন্ত নাই, এমন কি সেখানে মাটিও নাই। কেবল কাঁকর অথবা প্রস্তরবৎ কঠিন লাল রঙের মৃত্তিকা; আর নিম্নস্থান সকল বন জঙ্গলে আবৃত; মাঝে মাঝে ঘন তালবৃক্ষ বেষ্টিত সুদীর্ঘ জলাশয়। সেই সকল জলাশয়ের একদিকে বা দুইদিকে মনুষ্যনির্ম্মিত, তালবৃক্ষসমাকীর্ণ বাঁধ দেওয়া, অপর দিকে স্বভাব হস্তনির্ম্মিত বাঁধ, যেখানে অনেক তালবৃক্ষ একস্থলে দেখিতে পাইতাম সেই খানেই এই প্রকার বাঁধ আছে বুঝিতে পারিতাম। বোধ করি "ডাঙ্গার" উপর অবস্থিত বলিয়া বাঁকুড়ার অনেক গ্রামের নামের শেষে "ডাঙ্গা" শব্দের যোগ দেখা যায়। এইরূপ অনেক গ্রাম অতিক্রম করিয়া এক দিন এক নিম্ন ভূমিতে অবতীর্ণ হইলাম।

৫

এই স্থানটী-নিবিড় জঙ্গলে আবৃত। আমার গন্তব্য পথের উভয় পার্শ্বে শাল, মহুয়া, আম্র প্রভৃতি প্রকাণ্ড বৃক্ষ এবং ঘনসন্নিবিষ্ট বাঁশ ঝাড়ে সমাকীর্ণ। স্থানে স্থানে পথটি এত গভীর বনের ভিতর দিয়া গিয়াছে যে দিনমানেও সে সকল স্থান অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হয়। পথের উভয় পার্শ্বের বাঁশ ঝাড়ের শাখা প্রশাখা পথের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পথটিকে একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। দূর হইতে মনে হয় পথটি বুঝি একটা সুরঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। আমার [illegible] একজন [illegible] বর্ষাকাল ভিন্ন এ সকল স্থানে ব্যাঘ্রভীতি হয় না।

বেলা প্রায় এগারটা হইল। পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া একটা আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছি, এমন সময় এক সাঁওতাল রমণী এক বোঝা কাঠ মাথায় লইয়া পার্শ্বস্থ জঙ্গল হইতে পথে প্রবেশ করিল। তাহাকে আশ্রয়ের কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, সম্মুখে কিছু দূরে পথের পার্শ্বে একখানা দোকান আছে। সেও সেই দোকানে যাইবে। তাহার সহিত প্রায় এক পোয়া পথ অতিক্রম করিয়া পথের পার্শ্বে একখানি কুটীর দেখিতে পাইলাম। সাঁওতাল রমণী কুটীর স্বামী দোকানদারের নিকট গিয়া সেই কাঠ দিয়া কিছু লবণ ও মুড়ি লইয়া প্রস্থান করিল। কুটীরস্বামী তাহার স্বাভাবিক বিকৃতস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল:—"আপনি ব্রাহ্মণ?" আমি বলিলাম "হাঁ।"

"প্রণাম" বলিয়া সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া একখানা চাটাই বাহির করিয়া দিল। আমি তাহাতে উপবেশন করিয়া কুটীর ও কুটীরস্বামীকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। কুটীরের আসবাবের মধ্যে একখানা চৌকি ও দশ পনেরটা হাঁড়ি। লোকটার আকৃতি দেখিলে ভয় হয়। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, খুব জোয়ান, মাথায় সুদীর্ঘ কেশ। সে আমার আদেশে রন্ধনাদির উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় একজন লোক আসিয়া আমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইল। আমি প্রথমে তাহাকে দেখিতে পাই নাই। পরে অন্যমনস্ক-ভাবে যেমন মুখ ফিরাইব, অমনি দেখিতে পাইলাম, কালান্তক যমের ন্যায় এক মূর্ত্তি আমার নিকট দাঁড়াইয়া আমার প্রতি আরক্ত নয়নে চাহিয়া আছে। লোকটা বোধ হয় পাঁচ হাত দীর্ঘ ও তদুপযোগী বলিষ্ঠ অবয়ব সম্পন্ন। মস্তকে কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, হাতে তৈলপক্ক লাল রঙের সুদীর্ঘ বাঁশের লাঠি। ক্ষুদ্র এক যোড়া সম্মার্জ্জনীর ন্যায় গোঁফ তাহার সেই তাম্রকৃষ্ণ ভীষণ বদনমণ্ডলকে ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছে। তাহার কাঁধে একখানা গামছা ও যজ্ঞোপবীত।

আগন্তুককে দেখিয়া সেই কুটীর স্বামী বা দোকানদার সসম্ভ্রমে করযোড়ে সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া পদরেণু লইল ও গৃহ হইতে একখানি ছোট চৌকি বাহির করিয়া তাহাকে বসিতে দিল। আগন্তুক তাহার অভ্যর্থনায় ভ্রুক্ষেপ না করিয়া আমার মুখের দিকে সুতীক্ষ্ম দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার সেই ভীষণ উজ্জ্বল চক্ষের দিকে

চাহিতে আমার সাহস হইল না। অকস্মাৎ সে আমাকে কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "নিবাস?"

আমি পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলাম যে, যাহার প্রতি কিছু সন্দেহ হইবে তাহার নিকট যথার্থ পরিচয় দিব না। শুনিয়াছিলাম যে, এ সকল দেশে দস্যুরা পথিকের পরিচয় লইয়া তাহার সহিত আত্মীয়তা করিয়া অবশেষে তাহার প্রাণবধ করে। নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে বাটী বলিলে আর বড় আত্মীয়তা করিতে প্রস্তুত হয় না। সেই জন্য অনেক স্থলে আমি আমার প্রকৃত পরিচয় ও বাসস্থান গোপন করিয়া মিথ্যা কথা বলিতাম। এখনও মনে মনে করিলাম যে, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে নিকটবর্ত্তী কোন একটা গ্রামের নাম করিব, কিন্তু সে অকস্মাৎ আমার নিবাস জিজ্ঞাসা করাতে, আমার সঙ্কল্প বাঁকুড়া জেলা হইতে বহুদূরে পলায়ন করিল। তাহার প্রশ্নে আমি চমকিত হইয়া বলিলাম, "হুগলি,"—

"ব্রাহ্মণ?"

"হাঁ।"

ব্রাহ্মণ শুনিয়া সে আমাকে নমস্কার করিল। অগত্যা আমিও প্রতিনমস্কার করিলাম। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল,—

"নাম?"

"রামশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।"

সে দুই তিনবার মাথা নাড়িয়া বলিল, "কুলীন?"

"হাঁ।"

"কোন ভাব?"

"স্বভাব।"

দীর্ঘ হইত। আমি ব্রাহ্মণের পশ্চাতে যাইতে ছিলাম তাহার অলক্ষে আমার পুঁটুলি হইতে সেই ছুরিখানা বাহির করিয়া আমার উত্তরীয়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম। মনে করিলাম, যদি তেমন তেমন দেখি তাহা হইলে সহসা ব্রাহ্মণের উপর পতিত হইয়া সবলে সেই ছুরি তাহার শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিব।

যাহা হউক, পথে আর ব্রাহ্ম হত্যা করিতে হইল না। তাহার সহিত প্রায় এক পোয়া পথ গলিতে গলিতে ঘুরিয়া অবশেষে এক গ্রামে উপস্থিত হইলাম, গ্রামটির চারিদিক বনজঙ্গলে আবৃত বলিয়া দূর হইতে তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায় না। গ্রামের প্রান্তে একটি বাটীর মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিলেন ও তাঁহার সেই স্বভাবতঃ কর্কশকণ্ঠ সাধ্যমত কোমল করিয়া আমাকে আহ্বান করিয়া লইয়া সদর বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিতে বলিলেন। দেখিলাম সে বাটীটি নিতান্ত ছোট নহে। চণ্ডীমণ্ডপখানি বেশ বৃহৎ। বৃহৎ প্রাঙ্গণে চার পাঁচটা ধানের মরাই। বাটির মধ্যেও ৫।৬ খানি ঘর। তার মধ্যে দুই তিন খানি দ্বিতল। কিন্তু সকল গুলিই তৃণাচ্ছাদিত ও মৃত্তিকার প্রাচীরে বেষ্টিত। বাড়ীটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমাকে বাহিরে বসাইয়া ব্রাহ্মণ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্ষণেক পরে দুই তিনটি বালিকা আমাকে দেখিতে আসিল, আমার মনে হইল, বাল্যকালে যখন বোসেদের বাটিতে ৺ দুর্গোৎসব উপলক্ষে বলিদানের জন্য মেষ ক্রয় করা হইত, তখন অনেক ছেলে, এইপ্রকার উৎসুক নয়নে সেই মেষ দেখিতে যাইত, তাহাকে কত যত্ন

[illegible]
বলিদানের সময় আনন্দে নৃত্য করিত! এই দস্যু বালিকারা আমাকে বোধ হয় সেইরূপ উৎসুক চিত্তে দেখিতে আসিয়াছে।

ক্ষণকাল পরে ব্রাহ্মণ তৈল আনিয়া স্বয়ং তৈল মাখিতে আরম্ভ করিল এবং আমাকেও তৈল মাখিতে বলিল। আমি তাহার সহিত গিয়া নিকটস্থ একটা জলাশয়ে স্নান করিয়া আসিলাম ও পুঁটুলি হইতে বস্ত্র বাহির করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলাম। একজন স্ত্রীলোক কিছু মুড়ি ও গুড় আনিয়া আমাদের উভয়কেই জলযোগ করিতে বলিল। জলযোগান্তে ব্রাহ্মণ গম্ভীরভাবে বসিয়া তামাকু সেবন করিতে লাগিলেন, আমিও আমার অদৃষ্ট, পলাইবার উপায়, প্রতিশোধ ইত্যাদি ভাবিতে লাগিলাম। বেলা প্রায় ১টার পর তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে আহারার্থ প্রবেশ করিলেন।

অন্তঃপুরে প্রবেশ কালে আমার লাঠি গাছটা আর সঙ্গে লইতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণ এ পর্য্যন্ত আতিথ্যের ত্রুটি বা বিরুদ্ধভাব দেখান নাই, সুতরাং লাঠি হাতে করিয়া আহারে যাইব কি বলিয়া? তথাপি সাবধানের বিনাশ নাই ভাবিয়া ছুরিটা বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম। কি জানি, ব্যাঘ্রের গহ্বরে প্রবেশ করিতেছি।

উভয়ে একত্র আহারে বসিলাম। আহার মন্দ হইল না। যদি প্রাণের ভয়ে চঞ্চল না হইতাম, তাহা হইলে মধ্যাহ্নে, সৌরভশালী সরু চালের ভাত, কলায়ের দাল, তিন চারি প্রকার ডালনা, অম্বল এবং অবশেষে দুগ্ধ ও বাতাসা অতি উপাদেয়

আহার একথা বলিতে বাধ্য [illegible] [illegible] ন্যায় গৈরিক বস্ত্র দেখিয়া ব্রাহ্মণ বোধ হয় [illegible] দিয়াছিলেন; সেইজন্য আমার আহার্য্যে আমিষের সম্পর্ক দেখিতে পাইলাম না। আহারের সময় দেখিলাম, অনেকগুলি স্ত্রীলোক চারিদিক হইতে আমাদিগকে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। মনে করিলাম, স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ কোমল হৃদয়া হইলেও দস্যু সহবাসে সে কোমলতা কঠোরতায় পরিণত হয়। তাহা না হইলে আমি ইহাদের বধ্য জানিয়াও ইহারা এ প্রকার সকৌতুক দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া থাকিবে কেন? আহারান্তে ব্রাহ্মণ অন্তঃপুরের একটা গৃহ দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি এই গৃহে বিশ্রাম কর। আমি একটু কার্য্যে বাহিরে যাইতেছি। অপরাহ্নে সাক্ষাৎ হইবে।"

আমি মনে মনে বলিলাম, অপরাহ্নে সেই সাক্ষাৎই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হইবে। কোথায় যাইতেছ, তাহা কি আমি বুঝিতে পারি নাই? আমার হত্যার জন্য লোক ডাকিতে যাইতেছ।

ব্রাহ্মণকে বলিলাম, "অন্দরে থাকিবার প্রয়োজন কি? আমি চণ্ডীমণ্ডপেই থাকিব।"

কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া আমাকে সেই অন্তঃপুরেই পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। আমি বুঝিলাম, আমি আজ এই ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরেই বন্দী হইলাম।

(৭)

আমি বন্দী। বিদেশে, অসহায়, একাকী, দস্যুর অন্তঃপুরে বন্দী। উপায়ান্তর না দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক

[illegible] হইতে দ্বার বন্ধ করিলাম। [illegible] [illegible] পড়ি[illegible] বাহির হইতে কেহ কখনও অজ্ঞাতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কিন্তু দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেখিলাম গৃহের অপর দিকে আর একটা দ্বার আছে। সেটা বাহির হইতে বন্ধ, ভিতর হইতে বন্ধ করিবার কোন উপায় নাই। কক্ষমধ্যে একখানি খাটে দুগ্ধফেননিভ সুশুভ্র কোমল বিছানা। অন্যদিকে একটা বস্ত্রাধারে কয়েকখানি বস্ত্র, প্রাচীরের নিকট কয়েকখানি পরিষ্কার থালা বাটি ইত্যাদি। আমি ধীরে ধীরে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। উত্তরীয় মধ্যে লুক্কায়িত সেই ছুরিখানা বাহির করিয়া মনে মনে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "এত দিন তোমাকে আশ্রয় দিয়া আসিয়াছি, আজ তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। আমার সাহস ও বাহুবল এবং তোমার তীক্ষ্ণধার কি আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না?" ছুরিখানি উন্মুক্ত করিয়া বালিশের নীচে রাখিয়া দিলাম, আবশ্যক হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যেই ব্যবহার করিতে পারিব।

শয্যায় শয়ন করিয়া মুদিত নয়নে চিন্তা করিতে লাগিলাম—পিতার স্নেহ, জেঠাই-মার আদর, সুলোচনার প্রেম। তার পর মনে পড়িল, পিতার মৃত্যুসংবাদ, সুলোচনার মৃত্যু। অকস্মাৎ মনে হইল, পিতার অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছে। সুলোচনার অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছে, আমারও অপঘাতে মৃত্যু হইবে কি? তার পর ক্রমে ক্রমে মনে পড়িল, আমার দ্বিতীয়া পত্নী কুসুমকুমারী। তাহার অপরাধ কি? তথাপি তাহাকে কত অবজ্ঞা করিয়াছি। এক দিনের জন্য একটু ভালবাসা দেখাই নাই। সে আমার মনস্তুষ্টির জন্য কত

উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তথাপি আমার হৃদয়ে তাহাকে স্থান দিই নাই। আজ যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে এ পৃথিবীতে তাহার ন্যায় কে কষ্ট [illegible] করিবে? যাহাকে স্মরণ করিয়া কুসুমকে দলিত [illegible]ছিলাম, সেই সুলোচনাকে আমি ধরিয়া রাখিতে পারি[illegible] কি? সে ত ফাঁকি দিয়া পলাইয়া গেল। তাহার ভা[illegible] যদি গাঢ় [illegible] আমাকে ফেলিয়া [illegible]ইত না। আজ আমার অপঘাত মৃত্যু হইলে সুলোচনা কি এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে আসিবে? যাহাকে হৃদয়ে বসাইয়া পূজা করিতাম, সে কাঁদিবে না; কাঁদিবে কুসুম। যাহাকে চরণেও স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইতাম, সেই কুসুম আমার জন্য চিরজীবন বৈধব্যানলে দগ্ধ হইবে। আমি মূর্খ, তাই কুসুমের মনে কষ্ট দিয়াছিলাম। হয়ত সেই পাপেই আমাকে আজ এই বিপদে পড়িতে হইল। কুসুম, কুসুম, আজ যদি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আমার এই বিপদ কাটিয়া যায় তাহা হইলে আমি তোমার নিকট করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; আমাকে কি ক্ষমা করিবে না? যদি এবার রক্ষা পাই, তাহা হইলে আর কখনও তোমাকে অনাদর করিব না।

পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত ও প্রাণভয়ে অবসন্ন হইয়াছিলাম। এক্ষণে আবার অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলাম। এই সুযোগে নিদ্রাদেবী কখন আসিয়া আমার চৈতন্য হরণ করিয়া লইলেন, কিছুই জানিতে পারিলাম না। সহসা কাহার পদশব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল। ডাকাত আসিতেছে নাকি? সচকিতে চাহিয়া দেখি,

চারি পাঁচটি যুবতী আমার কক্ষে বিচরণ করিতেছে! আমি ত অবাক! এ কি প্রকার ব্যবহার? অজ্ঞাতকুলশীল যুবকের শয়ন-কক্ষে যুবতীর প্রবেশ, ইহা কি এদেশের প্রথা নাকি? আমাকে চক্ষু চাহিতে দেখিয়া একজন যুবতী সহাস্যে আমাকে বলিল:—

"পুরুষ মানুষ, দিনের বেলায় এত ঘুম কেন? ওঠ, মুখে জল দাও, আমাদের সঙ্গে দুটো কথা কও।" আমি বিস্ময় ও বিরক্তি দমন করিয়া বলিলাম—

"পথ চলিয়া বড় কষ্ট হইয়াছিল; তাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।"

এই বলিয়া উঠিয়া বসিলাম। একজন এক ঘটি জল আনিয়া আমার হাতে দিয়া নিকটবর্ত্তী জানালা দেখাইয়া দিল। আমি জানালার নিকট গিয়া মুখ প্রক্ষালন করিয়া পুনরায় শয্যার উপর শয়ন করিলাম, একজন যুবতী বলিল,—

"তোমার বয়স অল্প। এর মধ্যে তুমি বেহ্মচারী হ'লে কেন? তোমার কি ঘরে কেহ নাই?"

এ প্রশ্নের কি জবাব দিব? নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলাম। আর একজন বলিল,—

"তোমার বিয়ে হয়েছে সন্নিসী ঠাকুর?"

আমি বলিলাম,—"সন্ন্যাসীর আবার বিবাহ কি?"

ওমা তাওত বটে! সন্নিসীকে যে বিয়ে কর্ত্তে নাই। তা নিকে, কি সাদি, কি কণ্ঠিবদল, কিছু হয় নি?"

আমি বলিলাম,—"বিবাহ হইয়াছিল, স্ত্রী মারা গিয়াছে।"

"ওমা! তাই বুঝি মনের দুঃখে সন্নিসী হয়েছ? আহা মরে যাই!"

এমন সময়ে তাম্রবর্ণা, তাম্রকেশা, তাম্রনয়না এক প্রাচীনা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা আসিয়া আমার শয্যার এক অংশ গ্রহণ করিল। আমিও গতিক ভাল নহে বুঝিয়া বালিশের দিকে সরিয়া বসিলাম। বৃদ্ধা উপবেশন করিয়া বলিল,—

"ভাই, একটা গান গাও ত।"

বৃদ্ধার কথায় সকলে আমাকে বিশেষ পীড়ন করিতে লাগিল; গান গায়িতেই হইবে, কিছুতেই নিস্তার নাই। আমি তাহাদের লজ্জাহীনতা দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলাম, কিছুতেই গান গায়িব না সঙ্কল্প করিলাম; কিন্তু অবশেষে আমারই হার হইল। কোন মতে তাহাদের কথা এড়াইতে পারিলাম না। অগত্যা গান ধরিলাম—

"বিপদবারিণী শ্যামা, দেখা দেমা একটি বার।
তোর অভয় চরণ ছেড়ে—"

আর গান হইল না। আর একজন তাম্রবর্ণা সেই প্রকার প্রবীণা, বোধ হয় প্রথমার সহোদরা হইবে, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—

"কি কচ্ছিস্ তোরা? এতক্ষণে কেঁড়েলির ডাল বার কর্ত্তে পাল্লি না? কেবলই বাজে কথা আর হাসি তামাসা? এই বলিয়া আর একটি যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—

"তুই যাত, বড় বঁটি খানা নিয়ে আয়।" বড় বঁটির কথা শুনিবামাত্র আমি সত্বর উপাধান নিম্নে হাত দিয়া ছুরির বাঁটটা দৃঢ়রূপে ধরিলাম। মাগীর এত বড় স্পর্দ্ধা। স্ত্রীলোক হইয়া আমার "কেঁড়েলি" বার করিবে? যদি মরিতে হয়,

পুরুষের হাতে মরিব, এই ডাকিনীর হস্তে বঁটির আঘাতে মরিব কেন?

এমন সময়, যাহাকে বঁটি আনিতে বলিয়াছিল, সেই যুবতী একখানা বড় বঁটি লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলে দ্বিতীয়া বৃদ্ধা দুইগাছা ইক্ষু লইয়া ছাড়াইতে লাগিল ও জলে ধুইয়া আমাকে খাইতে দিল। বঁটির অন্যপ্রকার ব্যবহার দেখিয়া আমি কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম বটে, কিন্তু তাহাদের "কেঁড়েলির" মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না।

অব্যবহিত পরে আর একজন যুবতী কিছু খোসা ছাড়ান ডাল,—বোধ হয় কলায়ের ডাল,—আনিয়া বৃদ্ধাকে দেখাইয়া বলিল, "দেখ দেখি কাঁড়া হয়েছে কি না?"

বৃদ্ধা বলিল, "ওমা! তুই কেঁড়িলি করছিলি? আমি আবার বকছিলেম।" এই বলিয়া ডালগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিল, "হয়েছে।"

হরি বোল হরি! এই কেঁড়িলি? ডাল শব্দটা প্রথমে আমার কানে যায় নাই। আমাদের দেশে কেহ বৃথা বাহাদুরী বা অকাল পক্কতা প্রকাশ করিলে আমরা চলিত কথায় তাহাকে কেঁড়েলি বলিতাম। বালকের "কেঁড়েলি" দেখিলে তাহাকে গুরুজনেরা চড়টা চাপড়টা দিয়া থাকেন। এ তবে সে কেঁড়েলি নহে? বঁটি লইয়া বৃদ্ধা যখন আক ছাড়াইতে বসিয়াছিল, তখন মনে করিয়াছিলাম, ইক্ষুখণ্ডকে কেঁড়েলি বলে; এ তাহাও নহে!

কেঁড়েলির ডাল পরীক্ষা করিয়া সেই প্রাচীনা আমাকে বলিল,—

"ভাই তুমি আমাদের ব্যাভার দেখে অবাক্ হয়েছ? তা হবারই কথা। তোমাকে ভিতরকার আসল কথা খুলে বলা হয় নাই কি না! কথাটা এই যে, আমার একটি আইবড় নাত্‌নী আছে; আজ আমার ছেলে তোমার পরিচয় পেয়ে তোমাকে আমাদের স্ব-ঘর জেনে বাড়িতে ডেকে এনেছে। ইচ্ছে, তোমার হাতে আমাদের পুঁটিকে সমর্পণ করে। তুমি যদি মেয়ে দেখে অপছন্দ কর, তা হলে জোর করে তোমার বিয়ে দেব না। আগে মেয়ে দেখ, তার পর বিয়ের কথা হবে। একজন গিয়ে পুঁটিকে ডেকে আনত।"

সর্ব্বনাশ! এক কুসুমের কথা মনে করিয়া প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল, তাহার উপর আবার এই ধাঙ্গড়ের দেশে বিবাহ? এমন সময় একটি অবগুণ্ঠিতা কিশোরীকে লইয়া একটি যুবতী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম— "আমার স্ত্রী আছে। আর বিবাহ করিব না। বৃথা কেন কন্যা দেখাইতেছ?"

"কুলীনের ছেলে, না হয় দুটো বিয়েই করিলে? তাত অমন হয়—" আমি আবার বাধা দিবার পূর্ব্বে বৃদ্ধা সেই কিশোরীর অবগুণ্ঠন মোচন করিল। আমি বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম,—

"এ কি? এ যে কুসুম! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? কুসুম এখানে কেন?"—

একজন যুবতী পশ্চাৎ হইতে আমার কর্ণ স্পর্শ করিয়া বলিল, "কুসুম আবার কে গো সন্নিসী ঠাকুর? এযে আমাদের পুঁটি।" (কর্ণ কিছু নিপীড়ন করিয়া) "স্ত্রী মারা গিয়েছে,

তাই মনের দুঃখে সন্নিসী হতে যাচ্ছ ?” (আবার নিপীড়ন) “বেশত তোমার কুসুমকে নিয়ে যাও, ওকে কে দেখ্‌বে ? সন্নিসী হয়েছেন ! গেরুয়া পরেছেন !” এই বলিয়া সবলে কর্ণ মর্দ্দন করিয়া দিল। আমার প্রাণের ভয়টা কাণের উপর দিয়া গেল, বাঘের কাঁড়া বিড়ালের আঁচড়ে কাটিয়া গেল দেখিয়া আমি আবার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—

“কুসুম এখানে কেন ? [illegible] কিছুই [illegible] পারিতেছি না—এ সব ব্যাপার কি ? আমি কি তবে ডাকাতের হাতে পড়ি নাই ?”

ডাকাতের নাম শুনিয়া সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। এমন কি কুসুমও অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে সেই হাসিতে যোগ দিল। তখন একটি যুবতী বলিল—

“রসিক চাঁদ ! কুসুমের মামার বাড়ী রাঢ় দেশে তা কখন শুন নাই কি ?”

দৃষ্টির সম্মুখ হইতে যেন একখানা যবনিকা সরিয়া গেল ! মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত বুঝিতে পারিলাম। সত্যই ত কুসুম তাহার মাতার সহিত রাঢ় দেশে মাতুলালয়ে আসিয়াছিল। এটা তবে ডাকাতের বাড়ী নহে, কুসুমের মামার বাড়ী, আমার মামা-শ্বশুরের বাড়ী !

বিদ্যার্থী।

(১)

আমার ছোট মামা এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। সংস্কৃত সাহিত্যে এম, এ, পাশ দিয়া যে তিনি কি করিবেন, তাহা দিন কতক ভাবিয়াই পাইলেন না। আমার মাতামহ খুব ধনবান্ ছিলেন, কিন্তু ধন অপেক্ষা মান তাঁহার অধিক ছিল। তিনি ভারতবর্ষের অনেক স্বাধীন ও অর্দ্ধস্বাধীন রাজা এবং তাঁহাদের মন্ত্রীদিগের দীক্ষাগুরু ছিলেন। উড়িষ্যার ছত্রিশগড়জাত মহল হইতে আরম্ভ করিয়া নেপাল এবং মণিপুর হইতে জয়পুর পর্য্যন্ত অনেক স্থানেই তাঁহার রাজা এবং মন্ত্রী শিষ্য বর্ত্তমান। মাতামহের দুই পুত্র এবং এক কন্যা। প্রথম পুত্র অর্থাৎ আমার বড় মামা খুব পণ্ডিত লোক ছিলেন, সংস্কৃতে তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। দাদা মহাশয় নাকি বলিতেন যে, সামান্য গৃহস্থের গুরুগিরি করিতে হইলে বিদ্যা না থাকিলেও চলে, কিন্তু রাজা রাজড়ার গুরুগিরিতে গোঁজা মিল দিবার যো নাই। যথেষ্ট শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিলে বড় লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারা যায় না। সেই জন্য তিনি বড় মামাকে বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষা দিয়া নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিয়া

তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজ রাজত্বে ইংরাজী না জানিলে নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় ... ছোট মামাকে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে বিদ্যা শিক্ষার্থ পাঠাইয়া দেন। বড় মামাও যে সামান্য ইংরাজী না জানিতেন তাহা নহে, তবে ছোট মামার ন্যায় নহে। শুনিতে পাই, ছোট মামা সংস্কৃত সাহিত্যে এম, এ, হইলেও বড় মামার নিকট কিছুই ছিলেন না।

বড় মামা অধিকাংশ সময় বাড়িতে থাকিতে পাইতেন না। বৎসরের মধ্যে ৮।১০ মাস কাল দেশে দেশে শিষ্যালয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ছোট মামা কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন।

আমি তখন কলিকাতায় বি, এ, পড়ি। কলেজের অবকাশ হইলে আমি মধ্যে মধ্যে মাতুলালয়ে যাইতাম, বলা বাহুল্য যে আমার মাতামহ কালগ্রাসে পতিত হইলেও তাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ রায়ভূষণ সমস্তই বজায় ছিল। ছোট মামা যখন এম, এ পাশ করিলেন, তখন আমাদের ও অঞ্চলে খুব ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। বড় মানুষের ছোট ছেলে এম্ এ পাশ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলে বলিতে লাগিলেন, "ছোট ঠাকুর এবার নিশ্চয় একটা হাকিম হবেন।" ছোট ঠাকুর কিন্তু হাকিম হইলেন না। মাতামহ বংশ চিরকাল "ঠাকুর" অভিধানে অভিহিত হইতেন। "বাবু" তাঁহারা ছিলেন না।

কলিকাতার বাসায় বসিয়া আছি এমন সময় এক পত্র পাইলাম, মা লিখিয়াছেন। নানাবিধ সংবাদের পর মা লিখিয়াছেন, "অবনী (আমার ছোট মামা, মার কনিষ্ঠ

সহোদর) একখানা চতুষ্পাঠী খুলিয়াছে।" ছোট মামা টোল খুলিয়াছেন শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। ছোট মামা,—যাঁহার বয়স সবে ২৩ বৎসর, যাঁহার মাসিক আয় প্রায় ৪ হাজার টাকা, তিনি অবশেষে টোল খুলিয়া, টুলো পণ্ডিত হইয়া, গরুচুরি, ছাগলচুরির প্রায়শ্চিত্ত বিধান দিবেন? ইহা কি সম্ভব? অথচ মা লিখিয়াছেন, তিনি চতুষ্পাঠী খুলিয়াছেন। ছোট মামাকে পত্র দিলাম, তিনি উত্তর দিলেন, "এবার পরীক্ষা দিয়া যখন আমার এখানে আসিবে তখন দেখিবে আমার কেমন চতুষ্পাঠী হইয়াছে।" অনুষ্ঠানটা অদ্ভুত তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। দেখিবার ইচ্ছা হইল।

(২)

পরীক্ষা দিয়া মামার বাড়ী চলিয়া গেলাম। কলিকাতা হইতে আমাদের পৈত্রিক বাটিতে যাইতে হইলে আমার মামার বাটীর গ্রাম দিয়া যাইতে হইত। মামার বাড়ীতে গিয়া দেখিলাম বড় মামা তাঁহাদের মহালে অথবা শিষ্যবাড়ী গিয়াছেন। ছোট মামাকে দেখিতে পাইলাম না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি তালপুখুর গ্রামে চতুষ্পাঠীতে থাকেন। তিনি এখনও অবিবাহিত।

তালপুখুর মামার বাড়ী হইতে দুই ক্রোশ দূরে একটি খুব ছোট অথচ গভীর নদীর উপর অবস্থিত। গ্রামটি মামাদেরই তালুক, স্থানটি বড় সুন্দর। মামার বাড়ী হইতে তালপুখুর পর্য্যন্ত বরাবর বাঁধা রাস্তা আছে। আমি তালপুখুর চিনিতাম, অনেকবার তথায় গিয়াছি। যে দিন মামার বাড়ী উপস্থিত

হইলাম তাহার পরদিন প্রাতঃকালে বাইসিকেলে চড়িয়া তাল-পুখুরে গমন করিলাম।

তালপুখুর গ্রামটি খুব ছোট। বোধ হয় ৫০ কি ৬০ ঘর লোকের বাস হইবে। সকলেই চাষ বাস করিত ও নদীতে মাছ ধরিত। গ্রামের বাহিরে একটু দূরে নদীর ধারে এক স্থানে প্রায় ২০।২৫ টি অশ্বথ বৃক্ষ ছিল। বৃক্ষগুলি বহু প্রাচীন এবং আমার মাতামহের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠিত। নদীর ধারে খোলা মাঠের মাঝখানে অর্দ্ধবৃত্তাকারে গাছগুলি রোপিত। প্রথম রোপিত হইবার সময় গাছগুলি বেশ দূরে দূরে ছিল; এক্ষণে কাল-সহকারে বৃদ্ধি পাইয়া নিত্যবর্দ্ধমান সাম্রাজ্যসমূহের ন্যায় পরস্পরের গাত্র স্পর্শ করিয়া অবশেষে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। দূর হইতে এই বৃত্তার্দ্ধকে বড় সুন্দর দেখাইত। নদীটি সেইস্থানে একটু ঘুরিয়া গিয়াছে। অশ্বথ বৃক্ষগুলি বৃত্তের অর্দ্ধেকটা অঙ্কিত করিয়াছিল, আর নদী স্বীয় বঙ্কিম গতিতে অপরার্দ্ধ রচিত করিয়া এই বৃত্তটিকে সম্পূর্ণকরিয়া তুলিয়াছিল। নদীর পরপারে অনুচ্চ শৈলরাজি। আমি মনে করিলাম ছোট মামা যখন তালপুখুরে চতুষ্পাঠী খুলিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই এই অশ্বথ-স্রোতস্বিনী-বেষ্টিত ভূ-খণ্ডটি মনোনীত করিয়া থাকিবেন। আমার অনুমান মিথ্যা হয় নাই।

অশ্বথতলায় গিয়া দেখিলাম, একখানি প্রকাণ্ড আটচালায় মামা টোল খুলিয়া বসিয়া আছেন। প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশটি গৈরিকবস্ত্র ধারী ছাত্র তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে। আমি গিয়া মামাকে প্রণাম করিয়া একান্তে জিজ্ঞাসা

করিলাম, "মামা আপনার এ আবার কি খেয়াল?" মামা সহাস্যে বলিলেন, "কিছু দিন থাক, তাহা হইলেই সব বুঝিতে পারিবে।"

পাঠের সময়টা আর মামাকে বিরক্ত না করিয়া আমি একবার ছাত্রাবাস প্রভৃতি দেখিতে বাহিরে গেলাম। নদীর ধারে সারি সারি ছোট ছোট অতি সুন্দর পর্ণকুটীর; কুটীরের প্রাচীর গোময়লিপ্ত, প্রাঙ্গণে ফুলগাছ। এই প্রকার বার তের খানি কুটীর দেখিলাম। দেখিয়া মনে বড় আনন্দ হইল, যেন দৃষদ্বতীর তীরস্থিত বৈদিক যুগের একটি তপোবন। এই তপোবনের পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া নদীটি প্রবাহিত হইয়াছে। শ্রেণীবদ্ধ ছোট ছোট কুটীরগুলির পূর্ব্বদিকে নদী আর পশ্চিমদিকে সেই আটচালা। কুটীরগুলির চারিদিকেই ফুলবাগান। যখন আমি তালপুকুরে উপস্থিত হইলাম, তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। আটচালা হইতে একটি সরল পথ ঠিক পূর্ব্বমুখে আসিয়া এই নদীর তীরে শেষ হইয়াছে। পথের শেষেই একটি বাঁধা ঘাট। উল্লিখিত কুটীরগুলি এই ঘাটের বামে ও দক্ষিণে সমান্তরালে অবস্থিত।

ঘাটের উপর আসিয়া উপস্থিত হইবা মাত্র দেখিলাম, পূর্ব্ব আকাশের কোলে রক্তবর্ণ সূর্য্য উদিত হইতেছেন। এমন সময় অকস্মাৎ শঙ্খধ্বনিতে চকিত হইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখি, আটচালার বিস্তৃত রোয়াকে মামার ছাত্রগণ করযোড়ে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া উদীয়মান তপনের প্রতি চাহিয়া আছেন। মামা স্বয়ং তাঁহাদের পশ্চাতে দণ্ডায়মান; হস্তে শঙ্খ। সূর্য্যদেব সম্পূর্ণ উদিত হইবামাত্র সকলে সমস্বরে কয়েকটি বৈদিক

স্তোত্র পাঠকরণান্তর যথেচ্ছা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। আমি মামার নিকট গিয়া বলিলাম, "মামা এ কি হুজুক করিয়াছেন ?" মামা আমা অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের বড় ; তাই মামা হই-[illegible] [illegible] বলিলেন, "দেখ, শোন ; সময়ে বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

(৩)

মামার আশ্রমে অথবা তপোবনে তিন চারি দিন অবস্থান করিলাম। দেখিলাম তাঁহার ছাত্রগুলি নানা জাতীয়। কেবল মানসিক উন্নতিই মামার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। শারীরিক উন্নতির প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট দৃষ্টি আছে। এমন কি মামা বলিলেন যে, "আমাদের শারীরিক উন্নতির আবশ্যকতাই সকলের অপেক্ষা অধিক। বিদ্যার অভাবে আমরা ঘৃণিত নহি, শারীরিক বল, হৃদয়ের আশা, মনের তেজ এই সকলের বিকাশ সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান বলিয়া মনে করি। আজ কাল কলিকাতা অঞ্চলে দেখিতে যে, পাই বাঙ্গালীর ছেলে বেশ সুশিক্ষা লাভ করিয়া ও ফিরিঙ্গিবেশে সজ্জিত হইয়া প্রকাশ্য সভাস্থলে যাইতে লজ্জাবোধ করেন না। কি দুর্ব্বল জাতি আমরা, মনে ভাব দেখি ! বাঙ্গালী যদি এত হেয় জাতিই হয়, তাহা হইলে ছদ্মবেশে আত্মগোপন করাই কি আমাদের একমাত্র উপায় ? শিক্ষার কি এই ফল ? যদি বাঙ্গালীর এমন কিছু কলঙ্ক থাকে যার জন্য আমরা জগতে মুখ দেখাইতে কুণ্ঠা অনুভব করি, তাহা হইলে কি মুখে চুণ

ও কালি মাখিয়া সেই কলঙ্ক গোপন করিতে হইবে? সে কলঙ্ক দূর করিতে হইলে ছদ্মবেশের প্রয়োজন কি? নিজ কার্য্যগুণে আমরা জগৎকে দেখাইব যে, তোমরা আমাদের যত হেয়, [illegible] ইংরাজ যখন এই উষ্ণপ্রধান দেশে আসিয়াও শীতকালোপযোগী পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয়, তখন আমরা নিজের জাতীয় পরিচ্ছদ ধুতি চাদর ত্যাগ করিয়া উঁহাদের পোষাকে আত্মগোপন করিয়া উঁহাদেরই দৃষ্টিতে কি উপহাসাস্পদ হই মনে কর দেখি? আমার ছাত্রদের শিক্ষণীয় বিষয়, আত্মসম্মান ও আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান।" দেখিলাম, বলিতে বলিতে ছোটমামা অত্যন্ত উত্তে-জিত হইয়া উঠিলেন। বালককাল হইতে মামার কেমন "স্ব[illegible]" "স্ব[illegible]" "স্ব[illegible]" "স্ব[illegible]" একটা বাতিক। ছোটমামার সহিত নানা বিষয়ে কথা কহিতে কহিতে আশ্রমের কিছু দূরে গিয়া দেখি, তাঁহার কয়েকজন ছাত্র স্বহস্তে নানাবিধ চাষের কাজ করিতেছে। মামা আমার মুখ দেখিয়াই আমার মনোগত প্রশ্ন বুঝিতে পারিলেন ও বলিলেন, "দেখ, ভারতের ২৮।২৯ কোটী লোকের মধ্যে ১৮ কোটী-কৃষিজীবী। কৃষির উন্নতি ভিন্ন আমাদের গতি নাই। আবার শিক্ষিত লোক উন্নত প্রণালীতে চাষে মন না দিলেও চাষের দুর্দ্দশা দূর হইবে না।" আরও কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া দেখি, একটী প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র "বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের জন্য" এইরূপ সাইন বোর্ড দ্বারা চিহ্নিত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমি আর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিলাম না। আমাকে হাসিতে দেখিয়া মামা বলিলেন, "অহমদনগরে সেকালে সামান্য মজুরেরা

এক একটি দামড়ি (সিকি পয়সা) দিয়া একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহা এখনও দর্শকদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। জব্বলপুরে সেকালে একজন সামান্য স্ত্রীলোক ময়দা পিশিয়া এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহা এখনও "পিশানহারীর" মন্দির নামে পরিচিত থাকিয়া জগতে একাগ্রতার অলৌকিক ক্ষমতার সাক্ষ্য দিতেছে। কত তীর্থে কত সন্ন্যাসী এক একটা কপর্দ্দক ভিক্ষা করিয়া পথিকদিগের জন্য কূপ খনন করাইয়া দিয়াছেন। আর এই বিংশ শতাব্দীতে এম, এ, উপাধিধারী সম্ভ্রান্ত বংশজাত আমি, যদি একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা গৃহের ও যন্ত্রাদির ব্যয় সংগ্রহ করিতে না পারি, তাহা হইলে কাহারও দোষ দিব না ; জানিব, আমাদেরই একাগ্রতা নাই।"

মামার কথার মধ্যে খাঁটি ধাতুর আওয়াজ শুনিয়া আমার মুখের হাসির রেখা লোপ পাইল। আমি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মামা, তুমি না হয় আত্মীয় স্বজন, পরিচিত অপরিচিত সকলের নিকট ভিক্ষা করিয়া ঘর খাড়া করিলে ও যন্ত্রাদি কিনিলে ; কিন্তু অধ্যাপক কোথায়? ভাল অধ্যাপক ত শাক বেগুনের মত শস্তা নয়।" মামা উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "কেহ যদি আত্মবিক্রয় করে, আত্মবলিদান দেয়, তবে হইলে স্বয়ং ভগবান ধরা দেন। সুতরাং অধ্যাপক দুর্লভ হইবে কেন? আপাততঃ আমার এক সহাধ্যায়ী বিজ্ঞানবিৎ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তিনি আমার সহিত একপ্রাণ ; তাঁহাকে লইয়া কাজ আরম্ভ করিব। এখন ভারতে দারিদ্র্যব্রতধারী শিক্ষকসম্প্রদায় গঠনের প্রয়ো-

জন হইয়াছে।" আমার মনে হইল, ছোটমামার মাথা খারাপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু তখনই মনে পড়িল, সংসারে যাঁহারা বড় কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই লোকে প্রথমে পাগল মনে করিয়া শেষে নিবৃত্ত হইয়াছে।

যখন আমাদের এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সেই সময় দেখিলাম, মামার একজন ছাত্র আমাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া একাগ্রচিত্তে আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন। তাঁহার সুন্দর প্রশস্ত ললাট, অথচ ক্ষুদ্র সুতীক্ষ্ণ চক্ষু ও ঈষৎ চাপা নাসিকা দেখিয়া বুঝিলাম তিনি বিদেশী, এমন কি তাঁহাকে দেখিয়া মঙ্গোলীয় বলিয়া মনে হইল। মামাকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলাম "ইনি কে?" মামা বলিলেন, "এস তোমাদের আলাপ পরিচয় করিয়া দিই—". এই বলিয়াই তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "Mr. Jatisin, here is my nephew Sailendra" তারপর আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "Mr. Jatisin is a student of mine. He has come from Nepal. He does not understand Bengali; understands a little English and Sanskrit."

আমি বলিলাম "এঁকে কোথা পেলেন?"

"দাদা চাটগাঁ না কোথা থেকে সঙ্গে করে এনেছেন! এঁর বাড়ী নেপাল, পিতা মাতা কেহ নাই। সংস্কৃত শিখিতে ইঁহার বড়ই আগ্রহ, ইনি কোথাকার হাসপাতালে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দাদার একজন বন্ধু সে কথা দাদার নিকট

বলাতে দাদা অনেক যত্নে ইঁহাকে হাসপাতাল থেকে এনে নিজের কাছে রাখেন। কিন্তু দাদা ভাল ইংরাজী জানেন না বলিয়া, সঙ্গে করে এনে আমার চতু[?] দিয়েছেন। ইনি বড় বুদ্ধিমান্।"

যাতিশিনের সহিত পরিচিত হইবার পর আমি সর্ব্বদা [illegible] সদ্ভাব হইল। কথাবার্ত্তা সমস্তই ইংরাজীতে হইত। একটা বড় আশ্চর্য্য দেখিলাম যে, যাতিশিন নেপালবাসী, বাঙ্গালারও অনেক স্থান ঘুরিয়াছেন, কিন্তু হিন্দি ভাষা বিন্দু মাত্র জানেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "আমার বাড়ী নেপালের খুব উত্তর প্রান্তে। সেখানকার ভাষা ঠিক নেপালিও নহে। নেপালি ভাষাও আমি ভাল জানি না।" তা হবে!

(৪)

অবকাশের অল্পদিনই পৈত্রিক আবাসে কাটাইলাম। অধিকাংশ সময় ছোটমামার তপোবনে থাকিতাম। যাতিশিনের সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা হইল। তাঁহার দাঁড়া দস্তুরে কেমন একটা আ[?] ভাব ছিল, দেখিলেই মনে হইত তিনি বড় লোকের ছেলে। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, যাতিশিন আমার সমবয়স্ক। আমি তাঁহাকে আমার বাইসিকেলে চড়াইতে শি[?]লাম। মামার তপোবনে আসিয়া যাতিশিন বাঙ্গালীর ন্যায় পোষাক পরিধান করিতেন। তাঁহার দেশের পোষাক কিরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, কতকটা চীনবাসীদের পোষাকের মত। আমি নানা প্রকার কথাবার্ত্তার মধ্যে তাঁহাদের সামাজিক প্রথা,

তাঁহার বিবাহ হইয়াছে কি না, তাঁহার পিতা মাতা বর্ত্তমান কি না, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—তাঁহার পিতা-মাতা বর্ত্তমান আছেন, পিতা রাজসরকারে চাকরি করেন। আমি বলিলাম যে, ছোটমামার নিকট শুনিলাম তোমার পিতা মাতা নাই; অথচ আজ বলিতেছেন পিতা মাতা আছেন? যাতিশিন যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "তাঁহার কথা আমি তখন ভাল বুঝিতাম না।" তাঁহার সামাজিক পদ-মর্য্যাদা কি প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলিলেন, "We priest not very rich not very poor." "আমরা পুরোহিত, বেশী ধনীও নই, বেশী গরীবও নই।"

আমার অবকাশ শেষ হইল, আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। সে বৎসর আমি বি, এ পরীক্ষা দিলাম; সেই জন্য পূজার ছুটিতে আর বাড়ী না গিয়া একেবারে পরীক্ষা দিয়া প্রায় একবৎসরের পরে দেশে ফিরিলাম। বাড়ীতে কিছু দিন থাকিয়া ছোট মামার চতুষ্পাঠীতে গমন করিলাম। যাতিশিনের সহিত দেখা হইবামাত্র তিনি দৌড়িয়া আসিয়া আমায় আলিঙ্গন করিলেন। এই বিদেশী যুবার সরল ব্যবহারে আমি একেবারে গলিয়া গেলাম।

যাতিশিন আমার হাত ধরিয়া তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলে দেখিলাম কক্ষটি তিনি সুন্দর রূপে সাজাইয়া রাখিয়াছেন! স্বহস্ত-নির্ম্মিত ছোট ছোট মাটির টবে স্বহস্ত-রোপিত ফুলগাছে কেমন ফুল ফুটাইয়া কক্ষ মধ্যে সাজাইয়াছেন! গৃহের মৃৎপ্রাচীরে সাদা কাগজ বসাইয়া তাহার উপর নানাবিধ পশু, পক্ষী, লতা, পাতা আঁকিয়াছেন। তাঁহার

সৌন্দর্য্যবোধ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলাম। হিমালয়বাসী, অনার্য্য মঙ্গোলীয় যুবার নিকট আমি যেন কত ছোট হইয়া পড়িলাম। এই যুবার সৌন্দর্য্যজ্ঞান আমাদের অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ, অথচ তাহাতে ইউরোপীয় বিলাসিতাপূর্ণ সৌন্দর্য্যের ছায়ামাত্র নাই। আমাদের পক্ষে এ এক নূতন জিনিষ!

একদিন অপরাহ্ণে যাতিশিনের সহিত নদীর তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার বাটীর জন্য মন চঞ্চল হয় না?"

তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হয় বৈকি। কিন্তু যখনই মন চঞ্চল হয়, তখনই মনে করি চীনদেশীয় ফা-হিয়ান, হোয়েন্থ-সাং ইত্যাদি মহাপুরুষেরা এই চাঞ্চল্য দমন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত কোটী কোটী লোকের প্রণম্য হইয়া আছেন। আমিও তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চেষ্টা করি। তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য, জ্ঞানের জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, আমি ধর্ম্মের জন্য জ্ঞানের জন্য সামান্য একটু চিত্তচাঞ্চল্য দমন করিতে পারিব না?'

উভয়ে বেড়াইতে বেড়াইতে নদীর ঘাটে জলের নিকট উপবেশন করিলাম। যাতিশিন এখন সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় চলনসই কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন। ইংরাজীতেও উন্নতি মন্দ হয় নাই। উভয়ে অন্যমনস্ক হইয়া কথা বার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময়ে তপোবন মধ্যে একটা গোলযোগ শুনিয়া আমরা সেই দিকে ধাবিত হইলাম। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। বেশ দিবালোক রহিয়াছে। দূর হইতে দেখিলাম, আট-চালার রোয়াকে বড়মামা, ছোটমামা এবং চারি পাঁচ জন সাহেব

ও পাঁচ ছয় জন বাঙ্গালী ভদ্রলোকে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। [illegible]
[illegible]
অকস্মাৎ কালান্তক যমের ন্যায় শান্তিরক্ষকের সমাগম দেখিয়া আমরা চকিত হইলাম। কিছু নিকটে গিয়া দেখিলাম, একজন প্রৌঢ় ইংরাজ ভদ্রলোককে ঘেরিয়া সকলে অতি সসম্মানে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। এই ইংরাজের পরিচ্ছদ যেন সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারীর পরিচ্ছদের ন্যায়, তবে বিশেষ জাঁক জমক নাই। অন্য দুই তিন জন ইংরাজ ভদ্রলোককে দেখিবামাত্র আমি চিনিতে পারিলাম। একজন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন জজ ও একজন পুলিশ সাহেব।

সেই প্রৌঢ় ইংরাজকে দেখিবামাত্র যাতিশিন কাঁপিতে কাঁপিতে আমার হাত ছাড়িয়া দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "my fathar !" এই বলিয়া ছুটিয়া গিয়া সেই সৈনিকবেশধারী ইংরাজের পদমূলে নতজানু হইয়া পতিত হইলেন। তাঁহার পিতা সাগ্রহে তাঁহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। আমি দ্রুতপদে নিকটে গিয়া আমার পরিচিত ম্যাজিষ্ট্রেট্, জজ ও পুলিশ সাহেবকে এবং যাতিশিনের পিতাকে অভিবাদন করিলে তাঁহারাও প্রত্যভিবাদন করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আমাকে বলিলেন,—

"My young friend, it is through you that His Excellency the Marquis of Jakatsu, the War Minister of Japan comes to know the whereabouts of his beloved son, the Honourable Jatisin."

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া মারকুইস মহোদয়কে নমস্কার করিলাম! তৎপর ক্রমে ক্রমে শুনিলাম যে, যাতিশিন সকলের অজ্ঞাতে গৃহত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসেন। তাঁহার পিতা এই মারকুইস যাকাৎসু তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। অনুসন্ধানের ফল এই দাঁড়ায় যে, যাতিশিন নামক একজন জাপানী যুবা প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত চট্টগ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে গমন করিয়াছেন, কর্ত্তৃপক্ষ তাহা জানিতে পারেন। বাঙ্গালার ছোটলাট এই যুবার অন্বেষণের জন্য প্রত্যেক জেলায় সংবাদ পাঠান। এদিকে আমার কলিকাতার এক সহাধ্যায়ী আমার নিকট যাতিশিনের কথা শুনিয়া নিজবাটীতে গল্প করেন; তাঁহার পিতা ছোট লাটের দপ্তরে কাজ করিতেন। তিনি যাতিশিনের বিষয় জানিতে পারিয়া ছোট লাটের সেক্রেটারীর নিকট গল্প করেন। তাহার পর একজন গোয়েন্দা মধ্যে আসিয়া তপোবনে যাতি-শিনের অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছিলেন। ভারতগবর্ণমেণ্ট এই সকল সংবাদ জাপানে মারকুইস্ মহাশয়কে প্রদান করিলে তিনি স্বয়ং আসিয়া পুত্রকে লইয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। ইতোমধ্যে ছোট লাটের আদেশে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব যাতিশিনের প্রতি নজর রাখিতে লাগিলেন।

মারকুইস্ স্বয়ং আসিয়াছিলেন, তাহার কারণ পাছে যাতিশিন জাপানে প্রত্যাগমন করিতে অসম্মত হয়েন। তাই আজ যাতিশিনকে লইবার জন্য ছোট লাটের একজন অনুচর মারকুইস মহোদয়কে লইয়া প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট

এবং তথা হইতে জজ, পুলিশ প্রভৃতি সকলে সমবেত হইয়া বড় মামার নিকট আগমন করেন এবং তাঁহাকে লইয়া এই তপোবনে আসিয়া যাতিশিনকে ধরিয়া ফেলেন।

বড়মামার আগ্রহে মারকুইস্ মহোদয় পরদিন তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ছোটমামা মারকুইসকে বলিলেন যে, যাতিশিনের যথার্থ পরিচয় না জানাতে তাঁহার প্রতি পদোচিত সম্মান প্রকাশ করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। মারকুইস মহোদয় ছোট মামার ধন্যবাদ করিয়া নানাবিধ সময়োচিত আলাপে মগ্ন হইলেন।

যাতিশিন আমাকে একান্তে বলিলেন, "তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, ইহাতে আমি বড়ই কাতর হইতেছি। কিন্তু উপায় নাই; আমার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য ব্যর্থ হইল. আমাকে গিয়া জাপানে সৈনিক শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। আমার পিতা জাপানের সমরসচিব। তাঁহার আজ্ঞা আমাকে পালন করিতেই হইবে। সংস্কৃত ও পার্শি শিখিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের মূল পুস্তক সমূহ জাপানী ভাষায় অনুবাদ করিব, এই আশা চিরকাল হৃদয়ে বলবতী ছিল। ভগবান্ তথাগত আমা দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিলেন না; বোধ হয় আমা-অপেক্ষা অধিক উপযুক্ত লোক আবশ্যক। যাহা হউক যদি কখনও সুবিধা পাও, একবার জাপানে যাইতে চেষ্টা করিও।"

যথাসময়ে আমাদের নিকট বিদায় লইয়া সপুত্র মারকুইস বাহাদুর প্রস্থান করিলেন। শুনিলাম, তাঁহারা বুদ্ধগয়া হইয়া শিমলা শৈলে বড় লাটের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেছেন।

আমি যাস্তিশিনের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া আছি, মনে করিতেছি আগামী শরৎকালে জাপানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব।

আমার বিস্ময়।

(১)

পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। দুই দিন দেওঘরে বাস করিয়া আমি ও আমার বাল্যবন্ধু অমরনাথ বৈদ্যনাথ জংশনে পশ্চিমের গাড়ীর অপেক্ষা করিতেছিলাম। একে শীতকালের রাত্রি, তাহার উপর আবার পাহাড়ে শীত, অল্‌ষ্টারের পকেটে হাত পুরিয়া দিয়া সিগারেটের ধূমে আনন্দা-লাভের বৃথা চেষ্টা করিতেছিলাম। শীতে প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া থাকা বড় কষ্টকর, তাই প্রণয়ীর প্রিয়সমাগমের ন্যায় ট্রেণের শুভাগমের বিলম্বে মুহূর্ত্তে মন্বন্তর জ্ঞান হইতেছিল; এমন সময়ে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় ত্রিশ মিনিট পরে, নির্ণিমেষ আরক্ত লোচনত্রয়ের জ্যোতিতে সম্মুখস্থ লৌহবর্ত্ম উদ্ভাসিত ও বাষ্পশ্বাসধ্বনিতে চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে চিরবাঞ্ছিত লৌহরথ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরাও কুলীর মাথায় পোর্টম্যাণ্ট প্রভৃতি তুলিয়া দিয়া মধ্যশ্রেণীর একটি গাড়িতে আশ্রয় লইলাম।

মনে করিয়াছিলাম, পশ্চিমের গাড়ীতে খুব জনতা হইবে। হয়ত সমস্ত রাত্রি বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া কাটাইতে হইবে। কিন্তু গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দেখিলাম, একজন হিন্দুস্থানী মাথায় একটা অতি বৃহৎ পাগড়ি বাঁধিয়া একখানা মোটা শীতবস্ত্রে

আপাদ-মস্তক ঢাকা দিয়া বেঞ্চির উপর পা তুলিয়া বসিয়া আছেন। গাত্রবস্ত্রের নীচে দিয়া তাঁহার তুলাভরা রঙ্গিন ছিটের পায়জামায় মণ্ডিত এক[illegible]চরণ দৃষ্ট হইতেছিল। তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কারণ, আমাদের উপবেশনের, এমন কি, শয়নেরও যথেষ্ট স্থান ছিল। কিন্তু অমর যদিও জানিত যে, বৈদ্যনাথে গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়ায়, তথাপি গাড়ীর দ্বার খুলিবামাত্র শশব্যস্তে একবার আমাকে উঠিতে অনুরোধ, একবার কুলিকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান, একবার পোর্টম্যাণ্টো বেঞ্চির নীচে আবার পরক্ষণে বেঞ্চির উপর ও আবার তৎক্ষণাৎ বেঞ্চির নীচে রক্ষণ করিতে গিয়া, মহা কোলাহলের সৃষ্টি করিল! বলা বাহুল্য, আমাদের কক্ষের সেই পাগড়ী[illegible] পশ্চিমে ভদ্রলোকটি বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে বিরক্ত মনে অমরের এই উৎপাত সহিতেছিলেন। তিনি সে রাত্রির মত নিদ্রার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত মনে করিয়া উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু গাড়ী প্লাটফরম ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার সেই পাগড়ী-মণ্ডিত মস্তকটি নিদ্রাভরে বাতায়নের কাচে ঢুলিয়া পড়িতে লাগিল।

সেদিন মাঘী পূর্ণিমা। আমরা পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, গাড়ীতে শয়নের স্থান পাইব না; তদনুসারে উভয়ে বিছানা বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলাম। পূর্ণিমা নিশীথে জ্যোৎস্নালোকে পার্ব্বত্য প্রদেশের শোভা সন্দর্শন করিবার জন্য আমরা দুই বন্ধু দুইটি কোণে আশ্রয় লইয়া মুখোমুখি হইয়া বসিলাম; বাতায়নের কাচ মাত্র তুলিয়া দিলাম। কাচের মধ্য দিয়া

চন্দ্রালোক তির্য্যগ্‌ভাবে আমাদের কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিতেছিল। অমর হারমোনিয়ম্ লইয়া মৃদুগ্রামে বাজাইতে আরম্ভ করিল ও বলিল, 'সুরেশ! একটা গান গাও।'

এখন আমার নিজের পরিচয় দান আবশ্যক। আমি, শ্রীসুরেশ চন্দ্র মিত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আসন্ন এম্, এ; অর্থাৎ, এম্, এ, পরীক্ষা দিয়াছি, কিন্তু পরীক্ষার ফল এখনও বাহির হয় নাই। উপাধি "মিত্র" বলিয়া যেন কায়স্থ মনে করিবেন না; আমি ব্রাহ্ম; আমার ভগিনীদের ব্রাহ্মমতেই বিবাহ হইয়াছিল; পিতা এখন পরলোকে। সংসারে মাতা, দুই ভগিনী, একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও স্বয়ং আমি। কলিকাতায় দুই খানি বাড়ী আছে; তাহারই ভাড়ায় এক প্রকার সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যায়। এম্, এ, পাস হইলে বিলাতে যাইব, কি কোন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইব, তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। ভায়া শ্রীমান্ সুরথচন্দ্র এই বৎসর এফ্, এ, দিবেন।

বন্ধুমহলে সুকণ্ঠ বলিয়া আমার একটু পশার আছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে "শিক্ষিতের" অবশ্যজ্ঞাতব্য বলিয়া যাহা কিছু বিবেচিত হইত, আমাতে তাহার সকলই ছিল। বলিয়াছি, সুকণ্ঠ বলিয়া আমার খ্যাতি ছিল; আমি হারমোনিয়ম্, পিয়ানো ও বাঁশী বাজাইতে পারিতাম! ফটোগ্রাফ তুলিতে বেশ দক্ষ ছিলাম, বাইসিকেলে হাত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতাম, এবং সুলভমূল্যে একটা ফনোগ্রাফও কিনিয়াছিলাম। 'বিকাশ' এবং 'হিল্লোল' পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে পদ্য গদ্য রচনা দিতাম; আমাদের ডিবেটিং ক্লবের প্রেসিডেণ্ট

ছিলাম। ইহাতেও যদি পাঠকেরা আমার পরিচয় না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি নাচার। আমার চেহারা না দেখিলে তাঁহারা [illegible] না; কিন্তু আশা আছে, কোনও অদূর ভবিষ্যতে 'ভুইফোঁড়' পত্রে আমার প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইতে পারে! অমরের আর অন্য পরিচয় অনাবশ্যক; আমারই বন্ধু, জাতিতে ব্রাহ্মণ, এবং বি, এ, ফেল, এই প্রভেদ। সে উপবীত পরিত্যাগ না করিলেও ধর্ম্মবিশ্বাসে আমার অপেক্ষা অধিক অন্ধকারে ছিল না। তাহার পিতা হাইকোর্টের উকীল।

অমর হারমোনিয়মের একটা চাবি টিপিয়া সবলে বেলো করিয়া বলিল, "সুরেশ! একটা গান গাও।"

আমি বলিলাম, "কি গায়িব?"

"যা ইচ্ছা তাই গাও; এমন পূর্ণিমা রাত; যা প্রাণ চায় তাই গাও—"

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে আরম্ভ করিলাম :—

"আঁহা কিবা চাঁদিনী রাতি হেরলো সখি—"

দূরে তারকামণ্ডিত ম্লান নীল আকাশের কোলে নন্দন পাহাড় দেখা যাইতেছিল। নন্দনপাহাড়ের শিখরে সেই ভগ্ন গৃহ ও বৃক্ষটি পর্য্যন্ত তুষারশুভ্র কৌমুদীতে চিত্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। এক এক বার লৌহবর্ত্মের পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা-স্তূপের অন্তরালে নন্দনপাহাড় ঢাকা পড়ে, আবার ক্ষণ পরে পূর্ব্ব আকাশের কোলে আষাঢ়ের অপরাহ্ণের পশ্চিমে মেঘের ন্যায় ভীমকান্ত-মূর্ত্তিতে চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়।

[illegible] দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া [illegible]

"আকাশ প্লাবিল ভাসিল রে, বিমল চন্দ্র করে।—"

কিন্তু আর গান হইল না। আমার সম্মুখে, অমরের পশ্চাতে, গাড়ীর লৌহ গরাদের পার্শ্বে একখানি চাদর টাঙ্গান ছিল। বোধ করি কেহ সপরিবারে কোথাও যাইতেছিলেন। হঠাৎ সেই চাদরের একপার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেখিলাম, একখানি মুখ, শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে প্রতিভাসিত মর্ম্মরশুভ্র ললাট, তাহার উপর কুঞ্চিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ, কৃষ্ণতার খঞ্জননেত্র, আর আরক্ত বিম্ববৎ ওষ্ঠাধর। আমার চক্ষু সুন্দরীর আয়ত লোচনে প্রতিবিম্বিত হইবামাত্র মুখখানি চাদরের অন্তরালে সরিয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্য, চকিতের ন্যায় আমার বক্ষে তাহার কটাক্ষবিদ্যুৎ বিদ্ধ হইল। গানের মাঝখানে অকস্মাৎ গান বন্ধ করিয়া অমরের দিকে চাহিলাম। অমর, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কোলের উপর হারমোনিয়ম রাখিয়া একমনে বাজাতেছিল। গান বন্ধ দেখিয়া, একটা চাবি টিপিয়া ধরিয়া অমর জিজ্ঞাসা করিল, "চুপ করিলে যে?"

"গান মনে পড়িতেছে না, ভুলিয়া গিয়াছি।"

"সব সখি মিলি এক তানে—"

"মনে হইয়াছে; অনেক দিন ও গানটা গাহি নাই—" আমি আবার গান ধরিলাম—অমরও আবার চক্ষু মুদিয়া হারমোনিয়ম ধরিল।

এমন সময়ে অমরের পশ্চাতের পর্দ্দাটা আবার একটু দুলিয়া উঠিল। আমি সাগ্রহে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র—হায়!

"নবীন তপস্বিনীর" জলধরকে মনে পড়িল, "ভাবছি মালতী, এলেন কি না বিদ্যাভূষণ!"—পর্দ্দার অন্তরালে এক শুভ্র শ্মশ্রু, হৃষ্টপুষ্ট, প্রশান্ত, চসমান্বিত মুখ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

আমি গান বন্ধ করিয়া অপরাধীর ন্যায় একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিলাম, "চীৎকার ক'রে আপনাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত করেছি, ক্ষমা করুন—"

শুভ্রশ্মশ্রুর অধিকারী সহাস্যে বলিলেন, "আমরা আপনার গানে বড় আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম; আপনার কি সুন্দর আওয়াজ! গান বন্ধ করিলেন কেন?"

"আপনাদের বিরক্তির ভয়ে—"

"বিলক্ষণ! সুমধুর সঙ্গীতে বিরক্তি?"

ভদ্রলোকের কথায় অমর একটু সসম্ভ্রমে ফিরিয়া বসিলে ভদ্র লোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা দুইজনে পশ্চিমে বেড়াইতে যাইতেছেন?" এইবার অমরের পালা; সে বলিল "কখনও পশ্চিমে যাই নাই, তাই একবার দুই বন্ধুতে বিদেশভ্রমণে বাহির হইয়াছি। মহাশয় কোথায় যাইবেন—জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

"আমার স্ত্রীর অসুখ, তাই সপরিবারে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য লক্ষ্ণৌ যাইতেছি। সেখানে আমার একটি বন্ধু আছেন, তাঁহার ওখানে দুই এক মাস থাকিবার ইচ্ছা আছে।"

ক্রমে ক্রমে তাঁহার সহিত বেশ আলাপ পরিচয় হইল। তিনি আমাদিগকে দুইটা ভাল চুরুট দিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহার সাক্ষাতে ধূমপান সঙ্গত বিবেচনা করিলাম না। তিনি ধূমপান করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাতে

ধূমপান না করাতে তিনি মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন বলিয়া বোধ হইল। কেন জানি না, তাঁহার সন্তোষ-উৎপাদনে আমার কেমন যেন একটু আন্তরিক ইচ্ছা হইল। পরিচয়ে জানিলাম তাঁহার নাম হেমাঙ্গকুমার চক্রবর্ত্তী—পেন্সনপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা মোগলসরাই ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের গাড়ী ত্যাগ করিয়া আউদ-রোহিল খণ্ডের গাড়ীতে যাইবার জন্য ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইলেন। আমি ও অমর যথাসাধ্য তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু তিনি একাই এক শত। তাঁহার সেই প্রাচীন শরীরে কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। তাঁহার অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী প্রৌঢ়া পত্নী, দুইটী কন্যা, এক জন দাসী, চারি পাঁচটা পোর্টম্যাণ্টো ও বিছানা ইত্যাদি লইয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে বোধ হয় তাঁহারা দুই মিনিট সময়ও লাগিল না। আমাদের সহিত "শেক হ্যাণ্ড" করিয়া সহাস্য মুখে হেমাঙ্গবাবু অপর প্লাটফরমে গমন করিলেন। আমি সাহস করিয়া সেই খঞ্জন গঞ্জন নয়ন-শালিনীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিলাম না; যখন তাঁহারা চলিয়া যান, তখন চাহিয়া দেখিলাম, হেমাঙ্গ বাবুর কন্যারা পাদুকা ও মোজা ব্যবহার করেন। আমরা আমাদের কক্ষে আসিয়া বসিলাম।

(২)

বৈশাখ মাসের শেষে, আমাদের ব্রাহ্মমণ্ডলীতে একটা বিবাহ ছিল। বিবাহটি বেশ জমকাল গোছ। আমি বিবাহ সভায়

উপস্থিত ছিলাম, এবং কন্যাকর্ত্তার অনুরোধে গান করিতে ছিলাম। আমাকে ও টেবিল হারমোনিয়মকে ঘিরিয়া অনেকগুলি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন। আলোক, পুষ্পমালা, ছোট ছোট বালক বালিকা ও সমবেত জনতার একটা অস্পষ্ট আনন্দ কোলাহলে বিবাহবাড়ী যেন আনন্দনিকেতন বলিয়া বোধ হইতেছিল। বরটি আমার বন্ধু; সুতরাং আমি বরযাত্রী।

আমার গান শেষ হইবামাত্র সকলে আমাকে—অথবা আমার কণ্ঠস্বর ও সঙ্গীত রচয়িতাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে আমার পার্শ্বের জনতা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইয়া এক জন অকস্মাৎ সাদরে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "Hallo my young friend! How do you do?"

মুখ ফিরাইয়া দেখি হেমাঙ্গ বাবু!

হেমাঙ্গ বাবুর সহিত অনেক কথা হইল। পারিবারিক কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম, তাঁহার পত্নী ভাল আছেন ও এই বিবাহ বাড়ীতেই পুত্র কন্যা সহ আসিয়াছেন। হেমাঙ্গ বাবু যখন পশ্চিমে যান, তখন তাঁহার পুত্রকে দেখি নাই;—আজ দেখিলাম, বেশ বিস্তৃতবক্ষ মাংসল সুন্দর দেহ তরুণ যুবা। হেমাঙ্গ বাবু বলিলেন, "আপনি এম, এ, পাশ হইয়াছেন, গেজেটে নাম দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলাম।"

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, আমি এম, এ, পাশ হইয়াছি। এলাহাবাদে আমার এক মাসীমা থাকিতেন. তিনি হিন্দু, এবং বিধবা। তাঁহার অনেক টাকার সম্পত্তি; বোধ হয়, বাৎসরিক

কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকা আর ছিল। মাসীমার পুত্রসন্তান ছিল না। অমর ও আমি যখন এলাহাবাদে যাই, তখন মাসীমার নিকট পনের কুড়ি দিন অবস্থান করি। মাসীমা আমাদিগকে দেখিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। প্রত্যেকের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—আহারের সময় নিকটে বসিয়া কত যত্নে, কত স্নেহভরে খাইতে বলিলেন। আমরা যে হিন্দুসমাজচ্যুত, মাসীমা যেন সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। মাসীমাকে প্রণাম করাতে তিনি আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু আমি লক্ষ্য করিলাম, আমাকে স্পর্শ করিবার পর হইতে আর গৃহের অন্য কোনও দ্রব্য স্পর্শ করিলেন না। সন্ধ্যার সময় স্নান করিয়া আবার শুচি হইলেন। আমরা যে কয় দিন তাঁহার নিকটে ছিলাম, তাঁহাকে প্রত্যহই সন্ধ্যাকালে এই প্রকার স্নান করিতে দেখিতাম। এই মাসীমাতার আলয়ে অবস্থান কালে আমি আমার পাশের খবর পাই। সুরথ আমার সহোদর, আমাকে টেলিগ্রাম করিয়াছিল।

বিবাহসভায় মাসীমার ইতিহাস, বোধ হয়, পাঠকগণের একটু অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইতেছে। কিন্তু পরে বোধ হয় তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবার সুযোগ পাইবেন। যাহা হউক, হেমাঙ্গ বাবু পুত্র কন্যা সহ আসিয়াছেন শুনিয়া আমার মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল; অনেক বালক বালিকাকে দেখিলাম, কিন্তু সেই রাত্রির সেই কৃষ্ণ নয়ন, আরক্তিম ওষ্ঠাধর দেখিলাম না। হেমাঙ্গ বাবুর আরও পরিচয় পাইলাম, তিনিও ব্রাহ্ম—উপবীতত্যাগী, কিন্তু আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন; আমরা "নববিধান," তাঁহারা "উন্নত"।

যথা সময়ে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল, আহারাদি শেষ হইল। আমি কর্ম্মকর্ত্তা ও অন্যান্য পরিচিত লোকের নিকট বিদায় হইলাম। হেমাঙ্গ বাবু তাঁহার ঠিকানা দিয়া বলিলেন "আপনাকে আমাদের বাড়ীতে দেখিলে বড় সুখী হইব।"

আমিও সম্মতি জানাইয়া বিদায় হইলাম।

(৩)

চারি পাঁচ দিন পরে এক দিন আমি ও অমর হেমাঙ্গ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। হেমাঙ্গ বাবু অন্তঃপুরে ছিলেন তাঁহার পুত্র হেমন্তকুমার আমাদিগকে অভ্যর্থিত করিয়া তাঁহাদের পাঠাগারে বসিতে বলিয়া পিতাকে সংবাদ দিতে গেল। হেমাঙ্গ বাবুর খুব বড় লাইব্রেরি; দুইটা গৃহ পুস্তকে পরিপূর্ণ। দর্শন, বিজ্ঞান, কবিতা, ইতিহাস, ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত সকল প্রকার পুস্তকই আছে। হেমাঙ্গ বাবুর আবাস বাটী ও গৃহসজ্জা দেখিয়া তাঁহাকে ধনবান বলিয়া বোধ হইল। প্রায় পনের মিনিট পরে হেমাঙ্গ বাবু বাহিরে আসিলেন; আমাকে, বিশেষতঃ অমরকে দেখিয়া যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং অনেকক্ষণ নানাবিধ কথাবার্ত্তার পর আমাদের দুইজনকে কিছু জলযোগ করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "সুরেশ বাবুকে আমি জোর করিয়া জল খাওয়াইতে পারি, কিন্তু অমর বাবুকে বলিতে পারি না; কারণ আমরা হিন্দু সমাজচ্যুত 'বেম্ম'।"

এই বলিয়াই তিনি হাহারবে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। হেমাঙ্গ বাবুর স্বভাবই এই; কোনও কথা বলিয়া একেবারে হাহারবে উচ্চহাস্য করেন।

আমি সহাস্যে বলিলাম, "অমরের আপত্তি থাকিলেও আজ সে আপত্তি খাটিবে না ; কারণ, আমি পূর্ব্বেই উহার জাতি মারিয়াছি। আমার অসাক্ষাতে অমর হিঁদুয়ানি করিতে পারে, কিন্তু আমার সাক্ষাতে নহে।"

বহির্ব্বাটী ও অন্তঃপুরের মধ্যবর্ত্তী একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে আমরা উপস্থিত হইলাম। হেমাঙ্গ বাবুর পত্নী হাস্যমুখে সম্ভাষণ করিয়া স্নেহময়ী মাতার ন্যায় আমাদিগকে জলযোগের জন্য অনুরোধ করিলেন। আমরা তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া জলখাবারগুলির সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিলাম।

হেমাঙ্গ বাবুর দুইটি কন্যাকেই দেখিলাম। জ্যেষ্ঠা যৌবনে পদার্পন করিয়াছেন, নাম বিমল কুমারী ;—সেই কৃষ্ণচক্ষু ও আরক্তিম ওষ্ঠাধরের অধিকারিণী। আর কনিষ্ঠা কমল কুমারী অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা।

আমি অল্পদিনের মধ্যেই হেমাঙ্গ বাবুর "ঘরের ছেলে" হইলাম বিমল আর আমাকে দেখিয়া পলাইয়া যায় না। প্রায় সকলেই আমাকে গান গায়িতে বলেন, আমিও অতি আগ্রহে গান গাই। বিমল আমার নিকট হারমোনিয়ম শিক্ষা করে।

বিমলের পাণিপ্রার্থী অনেকগুলি দাড়ি চশমা ওয়ালা গ্রাজুয়েট [illegible]। কিন্তু হেমাঙ্গ বাবুর নিকট হইতে কোন প্রকার উৎসাহ না পাইয়া একে একে সকলেই সরিয়া পড়িয়াছিলেন। কেবল আমিই স্বয়ংবর সভায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীরের ন্যায় একাকী রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলাম।

ইংরাজীতে একটি কথা আছে, হাতের খাবার মুখে দিবার পূর্ব্বেই তাহা হস্তচ্যুত হইতে পারে। অবশেষ আমার

কপালে তাহাই ঘটিবার সম্ভাবনা হইল। একদিন স্বয়ং হেমাঙ্গবাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "সুরেশ! আজ তোমাকে একটি কথা বলিব।"

হেমাঙ্গ বাবু এখন আমাকে "সুরেশ বাবু" বলেন না। আমি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। হেমাঙ্গ বাবু বলিতে লাগিলেন, "তুমি বোধ হয় বিমলকে পত্নীরূপে পাইলে সুখী হও?"

আমি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন "ভাল, বুঝিলাম, মৌনং সম্মতি লক্ষণং। এক্ষণে আমার একটি কথা আছে। তোমার সাংসারিক অবস্থা আমি জানি। তোমার মাসে দুই শত টাকা আয়, তোমারা দুই ভাই; সুতরাং ধরিতে গেলে তোমার এক শত টাকা আয়। আর আমার মাসিক আয় হাজার টাকার উপর। পেন্সন ছাড়া আমার কিছু জমিদারী ও কোম্পানীর কাগজ আছে; এ সমস্তই তুমি জান।"

আমি উদ্বিগ্ন চিত্তে উত্তর করিলাম, "জানি"।

"ভাল—আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া কি খাওয়াইবে? একশত টাকায় আপাততঃ এক প্রকার চলিতে পারে, কিন্তু, পরে তোমার সন্তানাদি হইলে তাহাতে কুলাইবে না। তুমি শিক্ষিত; অনায়াসে অর্থোপার্জ্জন করিতে পার। অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা কর। যখন তোমার মাসিক আয় এমন হইবে যে, তাহাতে তোমার সংসার স্বচ্ছন্দে চলিবে, তখন আমি বিমলকে তোমার হাতে সমর্পণ করিব।"

আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কত টাকা মাসিক আয়কে আপনি যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন?"

"অন্ততঃ মাসে তিন শত টাকা আয় না হইলে লোকে আজ কাল স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না। তোমার একশত টাকা আয় আছে; আরও দুই শত টাকা উপার্জ্জনের চেষ্টা কর। তাহা হইলে আমার আর কোন আপত্তি থাকিবে না।"

তিনি টাকা উপার্জ্জন, সৎপথে অবস্থান, সংসারে বিচরণ প্রভৃতি নানা প্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন;—কিন্তু কথাগুলি আমার কানে গেল, মাথায় গেল না। আমার মাথা ঘুরিতেছিল। পূর্ব্বে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, চাকরী করিব না। এখন মনে হইল, "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।"

হেমাঙ্গ বাবু অনেক কথাই বলিলেন, কিন্তু আমি মোটের উপর 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। দ্বারের নিকট আসিবামাত্র তিনি ডাকিয়া বলিলেন, "ইচ্ছা হয়, আজ বিমলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার। সে বড় হইতেছে, এখন অবধি তাহার সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন হইলে আমার পত্নী, অথবা হেমন্তের সাক্ষাতে দেখা করিও। পত্র দিতে ইচ্ছা করিলে আমার নামে পত্র দিও, আমি তাহাকে পড়িতে দিব। তুমি বুদ্ধিমান, বিদ্বান, এ প্রকার সাবধানতা আবশ্যক, তাহা তোমাকে বুঝাইতে হইবে না।"

আমি কিছু না বলিয়া কেবল নমস্কার করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলাম।

(৪)

প্রায় ছয় মাস অতীত হইয়া গেল। আমি চাকরির জন্য প্রথমে অনেক চেষ্টা করিলাম। অনেক জুটিল, কিন্তু সে চাকরি

স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হইল না। এ[illegible] দুইশত টাকা দূরে থাক, একটা পঞ্চাশ টাকার চাকরিও জুটাইতে পারিলাম না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভাবনায় স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল—হায়! বুঝি বিমলকে পাইলাম না!

একবার আমার সেই এলাহাবাদের মাসীমাকে মনে পড়িল। যদি মাসীমা ব্রাহ্ম হইতেন, যদি আমরা ব্রাহ্ম না হইতাম; কিন্তু তাহা হইলে কি বিমলকে পাইতাম? অসম্ভব! মনে হইল, একবার মাসীমার শরণাপন্ন হই, কিন্তু তিনি আমাকে টাকা দিবেন কেন? একেবারে না হয় দুই হাজার কি পাঁচ হাজার টাকা দিলেন, কিন্তু প্রতি মাসে দুই শত করিয়া টাকা দিবেন কেন? অবশেষে সমস্ত ক্রোধ একীভূত হইয়া হেমাঙ্গ বাবুর উপর পতিত হইল। তিনি কেন টাকার কথা তুলিলেন? যাঁহারা এক শত টাকার চাকরী করেন, তাঁহারা কি উপবাসী থাকেন? তিন শত টাকা কয় জনের মাসিক আয়? হেমাঙ্গ বাবু আমাকে পূর্ব্বে বলেন নাই কেন? তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত, বিমলের সহিত এত ঘনিষ্ঠতা করিতাম না। হেমাঙ্গ বাবুর উপর বড় রাগ হইল; স্থির করিলাম তাঁহাকে যেমন করিয়া পারি, প্রতিশোধ দিব। ক্রমাগত অসুস্থ হইতে লাগিলাম। অবশেষে চিকিৎসকের পরামর্শে এক ভৃত্য ও এক পাচক লইয়া নওয়াদা যাত্রা করিলাম।

প্রায় দুই মাস এই ভাবে কাটিয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার সময় ষ্টেসনে বেড়াইতেছি, একখানি পশ্চিমযাত্রী ট্রেণ প্লাটফরমে দাঁড়াইয়াছিল। ট্রেণে পরিচিত কাহাকেও দেখিলাম না।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল, এমন সময় একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক—টিকিট ঘর হইতে সবেগে বাহির হইয়া গাড়ীর সহিত দৌড়াইতে লাগিলেন, এবং অবশেষে একখানা মধ্য শ্রেণীর গাড়ীর হাতল ধরিয়া এক লম্ফে গাড়ীতে উঠিলেন। তিনি যেমন লাফাইয়া গাড়ীতে উঠিলেন, অমনি—দেখিতে পাইলাম,—তাঁহার পকেট হইতে একটা কি শ্বেতবর্ণ পদার্থ প্লাটফরমের নীচে একেবারে রেলের ধারে পড়িয়া গেল। কিন্তু তখন আর উপায় নাই। গাড়ী ছুটিতেছে, এবং দ্রব্যটাও চাকার নীচে পড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত গাড়ী চলিয়া যাইবার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। গাড়ী চলিয়া গেলে আমি সেইস্থানে গিয়া দেখি, কতকগুলি কাগজ; যেন দলীলের মত বোধ হইল। ভাবিলাম, ষ্টেসন্ মাষ্টারের জিম্মা করিয়া দিই;—যাঁহার হারাইয়াছে, তিনি অনুসন্ধান করিলেই পাইবেন।—কাগজের তাড়াটি হাতে করিয়া ষ্টেশন মাষ্টারের আফিসের নিকট যাইতে যাইতে একটা আলোকের নীচে গিয়া কাগজগুলা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য চক্ষের নিকট ধরিয়া দেখি, এক স্থানে লেখা আছে,—"হেমাঙ্গ কুমার চক্রবর্ত্তী।" আমি বিস্মিত হইয়া আবরণখানি উন্মোচন করিয়া দেখি, সেগুলি ইংরাজী ও বাঙ্গালা দলীল। ভাবিলাম, ষ্টেশন মাষ্টারকে দিব না; পর দিন হেমাঙ্গ বাবুকে পাঠাইয়া দিব।

পরদিন প্রাতঃকালে ডাকঘরে পোষ্টমাষ্টারের নিকট বসিয়া ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ দেখিতেছিলাম। দেখিলাম, হেমাঙ্গবাবু বিজ্ঞাপন দিতেছেন,—তাঁহার কতকগুলি দলীল চুরি গিয়াছে; যে চোরের বা দলীলের সন্ধান করিয়া দিবে, সে যথেষ্ট পুরস্কার

পাইবে। আমি সেই দিনই দলীলগুলি পাঠাইয়া দিব, সংকল্প করিয়াছিলাম। বিজ্ঞাপন দেখিয়া মনে হইল, ইহাকেই বলে বিধির নির্ব্বন্ধ। হেমাঙ্গ বাবুর দলীল চুরি গেল, কুড়াইয়া পাইলাম আমি!

এমন সময় চিঠি বাছিতে বাছিতে, চশমা ঈষৎ উত্তোলন করিয়া পোষ্টমাষ্টার বাবু আমাকে বলিলেন, "সুরেশ বাবু! আপনার একখানা রেজিষ্টারী চিঠি আছে।"

আমি রসীদ স্বাক্ষর করিয়া পত্র উন্মোচন করিয়া দেখি—অসম্ভব!

কলিকাতার চাটার্জ্জি উড এটর্ণি আমাকে লিখিতেছেন,—

"অতিশয় দুঃখিত হইয়া আপনাকে জানাইতেছি যে, আমাদের মক্কেল কলিকাতার শ্রীমতী ক্ষমাসুন্দরী দাসী (আমার সেই হিন্দু মাসীমা) কানপুরে ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে জ্বরবিকারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বাক্ষী এবং চিকিৎসকগণের সমক্ষে সজ্ঞানে এক উইল পত্র করিয়া যান। সেই উইলের মর্ম্ম অনুসারে ক্ষমাসুন্দরী তাঁহার ভগ্নীর পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র ও সুরথ চন্দ্র মিত্রকে তাঁহার সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী করিয়াছেন। কেবল উক্ত ক্ষমাসুন্দরীর ইচ্ছানুসারে তাঁহার সম্পত্তি হইতে দশ হাজার টাকা লইয়া কাশীতে এক শিবস্থাপন করিতে হইবে। এবং পাঁচ হাজার টাকা ক্ষমাসুন্দরীর দীক্ষাগুরু পাইবেন, এবং উক্ত দীক্ষাগুরুই শিবস্থাপনের সমস্ত কার্য্যে অধ্যক্ষতা করিবেন। এক্ষণে মেসার্স চাটার্জ্জি উড অত্যন্ত আনন্দের সহিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র ও সুরথচন্দ্র মিত্রকে এই সংবাদ

দিতেছেন যে, পত্র পাঠ করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব উভয় ভ্রাতায় একত্র চ্যাটার্জ্জি উড কোম্পানীর আফিসে আসিলে তাঁহারা সম্পত্তির তালিকা, দলীল ইত্যাদি আবশ্যক বিষয় জানিতে পারিবেন।”

মাসীমা লোকান্তরিতা হইয়াছেন শুনিয়া বড় কষ্ট হইল। কিন্তু আনন্দ আসিয়া শীঘ্রই সেই শোককে প্রশমিত করিল। মনে হইল, এইবার আমার বিমলকে পাইব। সেই দিনই নওয়াডী ত্যাগ করিলাম।

(৫)

রাত্রি ৯ টার সময় হাওড়া ষ্টেসন হইতে বরাবর হেমাঙ্গ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার সেই পুরাতন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “বাবু কোথায়?”

সে নমস্কার করিয়া বলিল, “পড়বার ঘরে।”

আমি আর অপেক্ষা করিলাম না।

পাঠাগারে উপনীত হইয়া দেখি, হেমাঙ্গ বাবু—একখানি বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। পদশব্দে চকিত হইয়া আমাকে দেখিয়াই সহাস্যে হাত বাড়াইয়া সাগ্রহে বলিলেন, “Hallo! সুরেশ কবে এলে? কেমন আছ? নওয়াডীতে ছিলে না? বেশ সেরেছ?”

“এই মাত্র নওয়াডী থেকে আসিতেছি—এখনও বাড়ী যাই নাই—”

“এখনও বাড়ী যাও নাই? তবে আহারাদিও হয় নাই?”

“হ'বে এখন, সেজন্য ব্যস্ত হইবেন না। আপনার সহিত আমার বিশেষ কথা আছে, তাই একেবারে আপনার নিকট আসিলাম।”

তিনি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কি কথা? এখনই বলিতে পার; কিন্তু আহারাদি করিয়া—"

"আহার পরে হইবে—আপনার কতকগুলি দলীল হারাইয়াছে?"

"হাঁ! তোমাকে কে বলিল?"

"খবরের কাগজে দেখিলাম, আপনি অনুসন্ধানকারীকে পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কি পুরস্কার দিবেন?"

অতি আগ্রহ সহকারে হেমাঙ্গ বাবু বলিলেন, "কেন তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? কোনও সন্ধান পাইয়াছ?"

"যদি বলি পাইয়াছি, তাহা হইলে আমাকে কি পুরস্কার দিবেন?"

তিনি সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। দুই তিন মিনিট পরে বলিলেন, "তুমি কি পুরস্কার চাও?"

আমি তাঁহার সম্মুখে দলীলগুলি রাখিয়া মৃদুস্বরে নত-মস্তকে বলিলাম, "যদি আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী হই?"

বোধ হয় আমার স্বরটা একটু কাঁপিয়া গিয়াছিল। তিনি একটু নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "তোমার সঙ্গে স্বতন্ত্র কথা, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। আজ হইতে আমার বিমল কুমারী তোমার হইল।"

এই কথা বলিয়া তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আমি দীর্ঘনিশ্বাসের অর্থ বুঝিলাম। আমার মনে রোমান্স জাগিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে তাঁহাকে বলিলাম,

"আমি আপনাকে বাধ্য করিয়া আপনার কন্যাকে লইব, আমাকে এতদূর কাপুরুষ মনে করিবেন না; আমি পুরস্কার প্রার্থনা করি না। আপনাকে প্রতিশ্রুত পুরস্কারের দায়ে ফেলিয়া আপনার কন্যাকে লইব, আমি এত নীচ নহি।" এই বলিয়া এটর্ণির চিঠিখানি তাঁহাকে দেখিতে দিলাম।

তার পর কি হইল আর বলিতে হইবে কি?

পার্শ্বভূত।

(১)

শনিবার অপরাহ্ণ চারিটার সময় আফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ধূলিধূসরিত আলপাকার চাপকান ও ঘর্ম্মসিক্ত কামিজটি খুলিয়া রাখিতেছি, এমন সময় প্রভাসকুমার আসিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা, আজ এক জায়গায় যাবেন ?"

বলিয়া রাখি, আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ মাত্র। বাস্তবিক আমি ঠাকুরদাদা হই নাই, তবে কলিকাতার একটা ষ্টুডেণ্ট-মেসে বা ছাত্রাবাসে শিং ভাঙ্গিয়া বাছুরের দলে ঢুকিয়াছিলাম বলিয়া মেসের সমস্ত যুবকেরা আমাকে আদর করিয়া "ঠাকুর-দাদা" বলিয়া ডাকিত। আর এইপ্রকার একটা হাস্যকৌতুকের মিষ্ট সম্বন্ধ না পাতাইলে বয়োবৃদ্ধ লোকের ছাত্রদের মেসে থাকিবার চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র।

বার্ণিস্-চামড়ার তালিযুক্ত পুরাতন প্যানেলার পাদুকা জোড়াটিকে পদচ্যুত করিয়া আমি বলিলাম,"যদি আহারের নিমন্ত্রণে হয়, তাহা হইলে এখনি প্রস্তুত, অন্যথা পরে বিবেচ্য।"

এই বলিয়া আমার কেওড়া-কাঠের তক্তপোষের নীচে হইতে সুমার্জ্জিত গাড়ু ও ঈষৎসিক্ত গাত্রমার্জ্জনী বাহির

করিয়া গৃহের বাহিরে গিয়া পায়ে হাতে জল দিলাম। ইত্যবসরে প্রভাসকুমার আমার জন্ত তামাকু সাজিল। গৃহে প্রবেশ করিয়া এক হাতে পাখা ও অপর হাতে হুঁকা লইয়া শ্রম অপনয়ন ও কলিকার আগুণ উদ্দীপ্ত করিতেছি, এমন সময়ে বাসার ঝি একটা বাটির ভিতরে শালপাতার ঠোঙ্গাসুদ্ধ চারি-পয়সার খাবার ও এক গ্লাস জল আনিয়া তোরঙ্গের উপর রাখিয়াদিল।

আমি জলযোগ করিয়া আমার চাপকানের পকেট হইতে পানের ডিবা বাহির করিয়া তন্মধ্য হইতে আফিসের ভুক্তাবশেষ একটি অর্দ্ধশুষ্ক তাম্বুল গ্রহণ করিয়া প্রভাসকে বলিলাম, "কোথায় যেতে হবে ?

"এসে বল্‌ছি"

এই বলিয়া প্রভাস আমার কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। আমি আপন মনে ধূমপান করিতে করিতে ভাবিলাম, ছেলেগুলা আজ থিয়েটারে যাবে বুঝি, তাই আমার এত খাতির। আমাকে খাতির করিবার একটু কারণও ছিল, আমি তাহাদের ঠাকুরদাদা হইলেও তাহাদের অভিভাবক ছিলাম। তাহারা আমার সাক্ষাতে পরস্পরে ইয়ারকি দিত, কিন্তু আমি তাহাদিগকে উচ্ছৃঙ্খল বা পাঠে অমনোযোগী হইতে দিতাম না। আমি মেসের ম্যানেজার ছিলাম, সেইজন্ত থিয়েটার বা সার্কাসে যাইতে হইলে আমাকে আগে জানাইত, নচেৎ সকালে সকালে খাইতে পাইত না।

৩।৪ মিনিট পরে প্রভাস, শরৎ, চারু, বীরেন প্রভৃতি মেম্বরগণ এক খানা ইংরাজী সংবাদপত্র লইয়া আবার আমার

কক্ষে প্রবেশ করিল। আসিয়াই কাগজে নীলপেন্সিলে দাগ-দেওয়া একটা অংশ আমাকে পাঠ করিতে দিল। কাগজখানি উল্টাইয়া দেখিলাম, ১০ সেপ্টেম্বর তারিখের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান! সেদিন ১৩ই সেপ্টেম্বর, সুতরাং কাগজখানি ৩ দিনের পুরাতন। চিহ্নিত অংশের উপর লেখা আছে—"The Chandernagore Ghost." যাহা পড়িলাম, তাহার অর্থ এই যে, চন্দননগর ষ্টেশনের উত্তরদিকে ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগ্‌ন্যালের নিকট একটা ভূত রাত্রিকালে আলোক দেখায়, অনেকে এই আলোক দেখিয়াছে। লেখক মহাশয়ও স্বচক্ষে এই আলোক দেখিয়াছেন। প্রবাদ এইরূপ যে, প্রথম রেল খুলিবার সময় একজন গার্ড সাহেব এই ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগ্‌ন্যালের নিকট হত হয়। সে-ই ভূত হইয়া রাত্রিতে আলোক দেখায়। আলোকের নিটবর্ত্তী হইলে আলোক বা আলোকধারী কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, ইত্যাদি।

বাসায় ছেলেরা ক্ষেপিয়াছে—আজ তাহারা ভূত দেখিতে যাইবে। আমার অনুমতি এবং সাহচর্য্য তাহারা প্রার্থনা করে। আমার নিজের বিষয় একটু বলিয়া রাখি। আমি শ্রীহীরালাল মিত্র স্বয়ং ভূত মানি, কিন্তু ভূতকে ভয় করি না। কথাটা আত্মশ্লাঘা নহে, কিন্তু কেন জানি না, ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকিলেও ভূতের ভয় আমার বিন্দুমাত্র নাই। আমাদের মেসে তিন চারিজন মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিল, তাহারা মড়া কাটে, মড়ার হাড় লইয়া নাড়াচাড়া করে এবং অসংখ্য ভূত সমাকুল কলেজ হাঁসপাতালে রাত্রি জাগিয়া নাইট-ডিউটি করে, সেইজন্য তাহারা ভূত মানিত না। তাহারা

আমার নিকট ভূতের গল্প শুনিয়া হাসিয়া উঠিত এবং সে সকল গল্প আমার কল্পনাপ্রসূত বা অতিরঞ্জিত বলিয়া উড়াইয়া দিত। তাঁহারা জ্যামিতির "বিন্দু" কল্পনা করিয়া তাহার উপর এতবড় একটা অঙ্কশাস্ত্র গঠন করিতে পারে, কিন্তু ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া জগতের কত দুর্ব্বোধ্য রহস্যের সিদ্ধান্ত করিতে তাহারা প্রস্তুত নহে। সেখানে তাহারা নানারূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়া কথঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করে। "স্নায়বিক বিকার" এবং "দৃষ্টিবিভ্রম" এই দুইটা শব্দ জগতের সাড়ে-পনেরো-আনা ভূত তাড়াইয়াছে। আমি মনে করিতাম একবার একটা সুবিধা পাইলে ইহাদিগকে দেখাই ভূত আছে কি না?

আমি প্রতি শনিবার বাড়ী যাইতাম না। বেতন পাইলে মাসে একবার করিয়া বাড়ী যাইতাম, সেই জন্য মনে করিলাম আজ একবার ভৌতিক ব্যাপারটা দেখিয়া আসি। প্রকাশ্যে বলিলাম "আজ শনিবারের রাত্রি, বারটা ভাল নয়।"

আমার আপত্তি শুনিয়া সকলে একেবারে হো হো রবে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। বলিল—"ঠাকুরদাদা এতদিন মরা ভূতের গল্প করিতেন আজ জীয়ন্ত ভূতের কথায় ভয় পেয়েছেন! তা, হবে না, আজ ঠাকুর দাদাকে নিয়ে যেতেই হবে। আমরা ভূতের ভাষা বুঝি না, আজ আপনাকে আমাদের ইণ্টারপ্রিটার হতে হবে।"

আমার যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কেবল তাহাদিগকে লইয়া রঙ্গ করিতেছিলাম; অবশেষে আমাদের যাওয়াই স্থির হইল। পাচককে ডাকিয়া সকালে সকালে আহারের বন্দোবস্ত করিতে বলিলাম। ছেলেরা ভূত ধরিবার বন্দোবস্ত

করিতে লাগিল। বর্ষাকাল, সকলেই ছাতি লইল, কাহারও লাঠি ছিল না, দুই একজনের সঙ্গে ষ্টিক্ ছিল, কিন্তু তাহা ভূত মারিবার পক্ষে যথেষ্ট মজবুত নহে। দুই একজন গোপনে ছুরি সঙ্গে লইল। বোধ হয়, তাহারা মনে করিয়াছিল, ভূত তাহাদের নিকট হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া থাকিবে, আর তাহা অবাধে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে ছুরি চালাইয়া তাহার স্বরূপ আবিষ্কার করিবে। একজন একটা অপেরাগ্লাস সঙ্গে লইল। আমাকে বলিল—"ঠাকুর দাদা, ভূত ধরিবার জন্য কিছু যন্ত্র লইবেন না ?"

আমি বলিলাম—"যন্ত্র আমার সঙ্গে আছে।"

শরৎকুমার বলিল, "কি যন্ত্র ?

আমি বলিলাম, "বিশ্বাস, একাগ্রতা ও ইচ্ছা শক্তি।

আমার কথা শুনিয়া তাহারা আবার উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদার বুজরুকিটুকু খুব আছে।

(২)

সাড়ে সাতটার ট্রেণে যাইব বলিয়া সকলে বাহির হইয়াছিলাম, হাবড়া-ষ্টেশনে প্রবেশ করিবা মাত্র সাড়ে সাতটার গাড়ি ছাড়িয়া দিল। আমরা অগত্যা আবার একঘণ্টা অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম। এই একঘণ্টা কেবল ভূতের গল্প লইয়া হাস্যপরিহাস চলিতে লাগিল।

যথাসময়ে গাড়ি ছাড়িল। মধ্যশ্রেণীতে আমরা আশ্রয় লইলাম। আমরা দলে সাতজন ছিলাম আরও ছয় সাত জন অফিসের বাবু মধ্যম শ্রেণীতে ছিলেন। বাবুদের সংখ্যা বালি হইতে

একটি একটি করিয়া কমিয়া অবশেষে শ্রীরামপুরে একটিমাত্র অবশিষ্ট রহিলেন। যিনি রহিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয় কোথায় যাইবেন ?"

"চন্দননগর।"

একটু ঔৎসুক্যে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ষ্টেশনে এই ভৌতিক ব্যাপারের কথা কিছু জানেন ?"

"নিজে বিশেষ কিছুই জানি না। গুজব ত নানা প্রকার শুনিতে পাই। কাল বুঝি না পরশু, একখানা মালগাড়ি দাঁড় করাইয়াছিল।".

তিনি আর কিছু জানেন না। আমরাও এই নিদ্রালু প্রৌঢ় কেরাণী বাবুটিকে অধিক বিরক্ত করা যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম না। সাড়ে নয়টার পর আমরা চন্দন নগরে উপস্থিত হইলাম। সেই বাবুটি এবং তৃতীয়-শ্রেণী হইতে আরও দশ বার জন অফিসের বাবু চন্দন নগরে নামিলেন ; গাড়িটা হুগলি পর্যন্ত যাইবে, সুতরাং হুগলির দশ পনেরো জন মাত্র আরোহী গাড়িতে রহিয়া গেল। আমরা যখন গাড়ি হইতে নামিলাম, তখন বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমাদের সহযাত্রী কেরাণী বাবুটির বাড়ী হইতে একজন খোট্টা ভৃত্য লণ্ঠন লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। মনিবকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত হইতে কোরিয়ার ব্যাগ এবং একটা পুঁটুলি গ্রহণ করিয়া আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিয়া গেল। সকলে চলিয়া গেলে আমরা টিকিট বাবুকে টিকিট দিয়া প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া রহিলাম। টিকিট বাবু বোধ হয় মনে করিলেন, আমরা বৃষ্টির ভয়ে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

গাড়িখানা চলিয়া গেলে, আমরাও টিকিট বাবুর লণ্ঠনের আলোকের সাহায্যে রেল লাইন পার হইয়া পূর্ব্বদিকের প্ল্যাটফরমে উপস্থিত হইলাম। মনে করিলাম, একবার ষ্টেশন্‌মাষ্টারের সহিত দেখা করিয়া কিছু সন্ধান লওয়া যাক্।

ষ্টেশন্‌মাষ্টারের আফিসে মাষ্টার বাবু বসিয়া ছিলেন। আমরা তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলে, তিনি আমাকে দলের চাঁই দেখিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—"বসুন, কিছু প্রয়োজন আছে?"

তাঁহার ভদ্রতায় আমি আপ্যায়িত হইয়া বলিলাম "বিশেষ কিছু প্রয়োজন নাই, আমরা কলিকাতা হইতে ভূত ধরিতে আসিয়াছি।"

তিনি সহাস্যে বলিলেন—"আপনাদের ঝোঁক মন্দ নহে, এই দারুণ বর্ষায় কলিকাতা হইতে ভূত দেখিতে আসিয়াছেন? হয় ত আজ দেখিতে পাইবেন না। কাল দুজন সাহেব এবং দশ বার জন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন কাল ভূত দেখা দেয় নাই।"

প্রভাস সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপারটা কি সত্য?"

"কোন্ ব্যাপারটা? আলোটা না ভূতটা?"

"দুইটাই?"

"আলোটা সত্য, আমি দেখিয়াছি এবং ষ্টেশন ষ্টাফের সকলেই দেখিয়াছেন; কিন্তু সেটা ভূত কি না, তাহা আপনারাও যেমন জানেন, আমিও তেমনি জানি। তবে গল্প গুজব নানাপ্রকার শুনিতে পাই, সে সকল বাজে কথা।"

আমরা মাষ্টার বাবুর সহিত বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি প্লাটফরমে আসিয়াই উত্তরদিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিলেন—"ওই ভূত দেখুন।"

আমরা সকলে মহা কৌতূহলী হইয়া উত্তর দিকে ডিষ্ট্যাণ্ট-সিগন্যালের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, লাইনের ধারে একটা বেশ উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে। উপরে, সিগ্‌ন্যালের মাথায় নক্ষত্রের মত দুইটা আলো জ্বলিতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ আলোটা? নীচের না উপরের?"

"উপরেরটা ত সিগ্‌ন্যালের আলো। নীচের আলো আমরা জ্বালি নাই, প্রত্যহ থাকে না এবং সমস্ত রাত্রিও থাকে না, হয় ত এখনি অদৃশ্য হইতে পারে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখান হইতে ও আলো কত দূর?"

"অনেকটা, প্রায় আধ মাইল হইবে। কেন? আপনি যাইবেন নাকি?

"ইচ্ছা করিতেছি!"

"আপনি পাগল হইয়াছেন? এই মূষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, তা ছাড়া লাইনে ভয়ানক সর্পভয়। বর্ষাকালে প্রায় প্রত্যহ গাড়ীর চাকায় সাপ কাটা যায়। ভূতের হাতে পড়িবার পূর্ব্বেই সাপের মুখে পড়া সম্ভব। আপনি ভিজি ভিজিতে অর্দ্ধেক পথ যাইবেন, আর হয় ত আলোক অদৃশ্য হইবে।"

এমন সময় আমরা দেখিতে পাইলাম, সেই নীচের আলোটা লাইনের ধার ছাড়িয়া লাইনের ঠিক মাঝখানে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

আমার ঔৎসুক্য বড়ই বাড়িয়া উঠিল। দেখিলাম ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয় ভদ্রতার খাতিরে আমাদিগকে এই বিপদসঙ্কুল স্থানে যাইতে দিবেন না, অথচ আমরা যাইব বলিয়াই কলিকাতা হইতে আসিয়াছি। বড় মুস্কিলে পড়িলাম, তিনি অনুমতি না দিলে আমরা লাইনের উপর দিয়া যাইতে পারি না, সেটা বে-আইনি কাজ।

আমার মনে পড়িল, যেখানে আলোকটা দেখা যায়, সেখানে একটা সাঁকো আছে। যদি ষ্টেশনের বাহির দিয়া ফরাসডাঙ্গার গড়ের ধারে ধারে সেই সাঁকোর কাছে যাওয়া যায় তাহা হইলে সর্পাঘাতের ভয় থাকে না এবং একেবারে ঐ সিগন্যালের নিকট যাইতে পারা যায়, কিন্তু সকলে দল বাঁধিয়া যাওয়া হইবে না। এ সকল রহস্য একাকী দেখিতে যাওয়া উচিত। বিপৎসঙ্কুল স্থানে কেন এই ভদ্রলোকের ছেলেদিগকে লইয়া যাইব? সেইজন্য একাকী যাইবার সঙ্কল্পটাই বাহাল রাখিলাম।

সহযাত্রিগণকে বলিলাম, "মাষ্টার বাবু বলছেন মন্দ কথা নয়। কাজ নাই আর ওখানে সাপের মুখে গিয়া, এইখান হইতেই ভূত দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়া যাক্।"

আমার প্রস্তাবে একে একে সকলেই সম্মত হইল। ডাক্তারীনবীশেরা আগে সম্মত হইল, তাহাদের ভূতের ভয় অপেক্ষা জলে ভিজিয়া সর্দ্দিতে ভুগিবার ভয় বেশী। ডাক্তারী-নবীশদের পরামর্শে সকলেই ইহাদের কথায় সায় দিল। অবশেষে সিদ্ধান্ত হইল যে, জল ছাড়িলে, জ্যোৎস্না উঠিলে, একজন কুলি এবং দুইটা লণ্ঠন ও লাঠি সোঁটা সঙ্গে লইয়া সকলে ভূত ধরিতে যাইব।

প্রথমে বলিয়াছি, আমার ইচ্ছা ছিল না যে, এই যুবকেরা ভিজিতে ভিজিতে সর্পসঙ্কুল স্থানে যায়। যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে আমাকেই দোষী হইতে হইবে, কেন না, আমিই দলপতি—সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। বাসা হইতে বাহির হইবার সময় সর্পভয়ের কথাটা মাথায় আসে নাই। কলিকাতায় বাস করিয়া অন্ধকার রাত্রি ও সর্পভয়ের কথাটা এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।

ষ্টেশনমাষ্টারের অনুগ্রহে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর বসিবার গৃহে স্থান পাইলাম। ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ফরাসীদের থানার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ১১টা বাজিল।

(৩)

সকলে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন, আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্লাটফরমে আসিলাম। দেখিলাম বৃষ্টি অনেক কমিয়াছে। বীরেন বলিল—"ঠাকুর দাদা, কোথায় যান ?"

আমি বলিলাম, "স্বভাবের ডাকে সাড়া দিতে।"

তাহারা আবার গল্পে মত্ত হইল।

আমি ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া গড়ের ধারের পথে পড়িলাম। গড়ের পথ ধরিয়া, শুক্লপক্ষের মেঘাবৃত রজনীর সামান্য আলোকে, ধীরে ধীরে সেই সাঁকোর উদ্দেশে চলিলাম। যে স্থানে সেই সাঁকোটা আছে, সেই স্থানকে গোঘাটা বলে। গড়ের পথ ছাড়িয়া আবার রেলের দিকে পশ্চিম মুখে ফিরিলাম। স্থানটী জনশূন্য, নিকটে একটা সানবাঁধান-ঘাটওয়ালা পুকুর—একখানা ভাঙ্গা তৃণকুটীর। আমি

সাঁকোর পাশ দিয়া রেল লাইনের উপর উঠিলাম। উঠিয়াই সম্মুখে উত্তরদিকে প্রায় একশত হাত দূরে সেই আলোক দেখিলাম। তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি স্থির, ঠিক যেন রেলওয়ে লণ্ঠনের আলোক। একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম, ষ্টেশন প্লাট্‌ফরমে সারি সারি আলো জ্বলিতেছে।

আমি আমার সেই সম্মুখের আলোকের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মনে একটু ভয় হইল। ভূতের ভয় নহে; ভয় হইল, যদি কোনও কলের গাড়ির গার্ড আমাকে এখন এইখানে দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে। মনে করিতে পারে, হয়ত আমি ভূত সাজিয়া ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। অথবা আমার পূর্ব্বে যদি কোনও অস্ত্রধারী লোক ভূত মারিতে আসিয়া নিকটে লুকাইয়া থাকে এবং আমাকে দেখিয়া ভূত মনে করিয়া গুলি করে, তাহা হইলেও মহাবিপদ্‌।

যখন আলোকটার নিকট হইতে কুড়ি হাত অন্তরে, তখন আলোকটা বামে ও দক্ষিণে নড়িতে লাগিল। আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। মনে হইল, যদি ভূত না হইয়া আলেয়া হয়, তাহা হইলে বিষাক্ত বায়ুতে আমার প্রাণ নষ্ট হইতে পারে। মনে করিলাম, ফিরিয়া যাই; আবার ভাবিলাম, এতটা আসিয়া ব্যাপারখানা কি, না দেখিয়াই ফিরিয়া যাইব? সেটাও যুক্তিসঙ্গত নহে। সত্য বলিতে কি, তখন পর্য্যন্ত আমার মনে কিছুমাত্র ভূতের ভয় হয় নাই। আমি আলোকের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বোধ হয়, আর দশ বার পদ অগ্রসর হইলেই আলোক

স্পর্শ করিতে পারি, এমন সময়ে আলোক অদৃশ্য হইল। যে মুহূর্ত্তে আলোক অদৃশ্য হইল, সেই মুহূর্ত্তে, কেন জানি না, আমার সর্ব্বাঙ্গ অকস্মাৎ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ঠিক সেই সময় স্পষ্ট শুনিলাম, সাহেব সুলভ গম্ভীরকণ্ঠে কে বলিল—'Good evening Babu." মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। সাহসে ভর করিয়া কথা কহিতে গেলাম, কণ্ঠ হইতে কোনও শব্দ নির্গত হইল না, অথবা একটা অব্যক্ত ধ্বনিমাত্র বাহির হইল। আলোক বা আলোকধারী কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। এমন সময় আমার বোধ হইল, কেহ যেন আমার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল। তখন বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছে, অল্প অল্প ভাঙ্গা ভাঙ্গা আলোকে কেমন যেন ঘোর-ঘোর হইয়া ছিল। স্কন্ধে স্পৃষ্ট হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, এক মনুষ্যমূর্ত্তি! সে মূর্ত্তি কি প্রকার, কেমন করিয়া বলিব? মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের আলোকে যতটুকু দেখিতে পাইলাম, তাহাতে বোধ হইল, সাহেবের ন্যায় পোষাক পরা, হাতে কোনও লণ্ঠন ত দেখিলাম না। পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেই সেই মূর্ত্তি আমাকে ইঙ্গিতে তাহার অনুসরণ করিতে বলিল। যাইব কি না, ভাবিবার সময় বা শক্তি পাইলাম না। এমন সময় আবার মনে হইল, যেন কেহ বলিল, "Follow me."

কথাটা বাহির হইতে আসিয়া আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল, কি আমার কল্পনাগ্রস্থ মস্তিষ্কের মধ্যে অনুভব করিলাম, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। স্বপ্নশ্রুত শব্দের ন্যায় আমি কিন্তু স্পষ্ট শুনিলাম—"Follow me."

তাহার অনুসরণ করা ভিন্ন আমার আর কোনও উপায় ছিল না। আমার নিজের ইচ্ছা শক্তি কোথায় চলিয়া গিয়াছিল। আমি যন্ত্রচালিত-পুত্তলিকাবৎ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম, সে আমার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। দেখিলাম, তাহার শরীর, গমনজনিত আন্দোলনে আন্দোলিত হইতেছে না। বাইসিকেলে ধাবমান ব্যক্তির শরীর যেমন সমান চলিয়া যায়—অধঃঊর্দ্ধ আন্দোলিত হয় না, সে সেই প্রকার যেন সমান ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তাহার চরণ যেন পৃথিবী স্পর্শ করিতেছে না; দেখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

গোঘাটার সাঁকোর উপর আসিয়া সে রেল্ লাইন ছাড়িয়া নীচে নামিল, আমিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। রেলের তারের বেড়া তাহাকে বাধা দিতে পারিল না, সে বেড়া গলিয়া অথবা উল্লঙ্ঘন করিয়া গেল না, যেমন সমান যাইতেছিল, তেমনি সমান যাইতে লাগিল। আমি তাহার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া যাইতেছিলাম, তারে বাধা পাইয়া পতনোন্মুখ হইয়া সাম্‌লাইয়া গেলাম। তারের বেড়া উল্লঙ্ঘন করিয়া আমিও পথে নামিলাম।

অন্ধকার কক্ষ মধ্যে ধুনার ধোঁয়া যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, আমিও এই মূর্ত্তিকে ঠিক সেই প্রকার দেখিতে পাইলাম। একটু দৃষ্টি স্থির করিয়া তাহার প্রতি চাহিলে বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহার স্বচ্ছ শরীরের ভিতর-দিয়া পরপারের বৃক্ষাদি দেখিতে পাইতেছি, আবার সেই সকল বৃক্ষাদি দেখিবার চেষ্টা করিলে তাহার শরীর চক্ষুর সম্মুখে

অন্তর্বান হইয়া দাঁড়ায়। ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, তাহার দেহটা স্বচ্ছ কি অস্বচ্ছ। ধূনুচির অগ্নিতে ধোঁয়া যেমন কতকটা জ্যোতির্ম্ময় দেখায়—ইহার শরীরও যেন কতকটা সেই প্রকার জ্যোতির্ম্ময়। মনে হইল, গাঢ়তম অন্ধকার হইলেও হয়ত ইহাকে ঠিক এমনি দেখিতে পাওয়া যাইত।

তাহার অনুসরণে পথে একটু অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় এক বিকট চীৎকারে আমি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলাম। পরক্ষণেই শব্দের কারণ বুঝিতে পারিলাম। একখানা এঞ্জিন আসিতেছে, তাহারই বংশীধ্বনি। গাড়ি আসিতে দেখিয়া সেই মূর্ত্তি পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল, এঞ্জিনের আলোকে চকিতের ন্যায় তাহার মুখ খানা দেখিয়া লইলাম। সে মুখ যেন শাদা খড়িতে গঠিত। মানুষের মুখ এত শাদা হইতে পারে কি? গাড়ি চলিয়া গেল, আমি তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

আমি তাহার অনুসরণ করিতে করিতে সেই বাঁধাঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মূর্ত্তি আমার দিকে ফিরিয়া বেশ সুস্পষ্ট স্বরে বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় বলিল—"বোস হীরালাল।"

আমি ত অবাক্! অবাক্ পূর্ব্বেই হইয়াছিলাম, এক্ষণে বিস্ময়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। আমার নাম জানিল কি প্রকারে? ঘাটে একটা বসিবার স্থান দেখাইয়া দিয়া সে আবার আমাকে বলিল—"এইখানে উপবেশন কর।"

এই বলিয়া সে আমার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বসাইয়া দিল। সে আবার বলিল—"তুমি খুব সাহসী, আজ তাহার পুরস্কার পাইবে।"

আমি মনে করিলাম, অন্ধকার রাত্রিতে পুকুরপাড়ে, নির্জ্জন স্থান, পুরস্কার দিবার কাল ও স্থানটা ঠিক হইয়াছে, আর পাত্রই বা মন্দ কি? একজন সজীব বাঙ্গালী কেরাণী, আর একজন মৃত সাহেব—ভূত!

আমার চিন্তায় বাধা দিয়া মূর্ত্তি বলিল, "আজ তুমি পুরস্কার পাইবে,—যাহা জানিতে আসিয়াছ, তাহা জানিবে। আমার পরিচয় দিব—"

তখন আমার মনে হইল, এ একজন বাঙ্গালী, ভূত-সাহেব সাজিয়া সকলকে ভয় দেখায়, নচেৎ সাহেব এমন বাঙ্গালা কথা কহিতে পারে কি?

মনে এই প্রশ্ন উদিত হইবামাত্র সে বলিল—"সাহেবের মুখে বাঙ্গালা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতেছ? আমাদের সময়ে অনেক সাহেব বেশ বাঙ্গালা জানিত। আমার এক জ্ঞাতিভাই ছিল, সে বাঙ্গালায় কবির দল করিয়াছিল, তাহার নাম শুন নাই কি?"

আমি স্থির ভাবে বলিলাম—"আণ্টনি ফিরিঙ্গির কবির দল ছিল শুনিয়াছি, সেই কি?"

"হাঁ, সেই আণ্টনি আমার ভাই হইত, আমার নাম গষ্টেভ (Gustave). যখন এই রেল লাইন প্রথম খোলা হয়—তখন আমি গার্ড ছিলাম।"

আমি বলিলাম, "সেইরূপ একটা জনরব শুনিয়াছি বটে।"

"জনরব নহে, সত্য কথা। আণ্টনি কবিওয়ালার বাড়ী কোথায় ছিল জান?"

"না।"

"এই চন্দননগরের দক্ষিণে গরুটিতে। সে স্থানটাও ফরাসী-দের। আমার বাড়ীও এই গরুটিতে ছিল। আমাদের বাড়ীর কাছে একজন বাঙ্গালীবাবু, কোথাকার জমীদার আসিয়া বাস করেন। কোথা হইতে আসিয়া বাস করেন, তাহা জানি না। কিন্তু আমার ভাই সেই কবিওয়ালার সঙ্গে তাঁর খুব আলাপ ছিল। তিনি আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিতেন, আমিও তাঁদের বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতাম। আমরা তখন বাঙ্গালীর মত কাপড় পরিতে সঙ্কুচিত হইতাম না। এখন কিন্তু দেখিতে পাই, বাঙ্গালীরাই বাঙ্গালীর পোষাক পরিতে লজ্জিত হয়। গ্রীষ্মকালে বাড়ীতে আমরা আমাদের সাহেবী পোষাক ছাড়িয়া তোমাদের মত বাঙ্গালী কাপড় পরিতাম; কিন্তু কোথাও যাইতে হইলে সাহেবী পোষাক পরিতাম।

"বাঙ্গালীবাবু যে বাড়ীতে বাসা লইয়াছিলেন, সে বাড়ীটা গঙ্গার উপরে; এমন কি বর্ষাকালে তাহার নীচেকার ঘরে জল ঢুকিত। বাড়ীটা যখন খালী পড়িয়াছিল,— বাবুরা ভাড়া লন নাই, তখন আমি কতবার সেই বাড়ীর মধ্যে একাকী বেড়াইতে যাইতাম। বাবুরা আসিবার পর আর আমি সে বাড়ীর অন্তঃপুরে যাই নাই। যাই নাই কেন, একবার গিয়াছিলাম; কিন্তু এখন মনে হয়, না যাইলেই ভাল হইত।

"এক দিন জ্যৈষ্ঠ মাসের সন্ধ্যার সময় আমি গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছি, এমন সময় দেখিলাম, একখানি নৌকা সেই বাবুদের বাটীর দিকে আসিতেছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের দক্ষিণে বাতাসে শ্বেত পাল ফুলাইয়া রাজহংসীর মত নাচিতে নাচিতে সেই নৌকাখানা আসিতেছে। যখন ঘাট হইতে আন্দাজ

পঞ্চাশ হাত দূরে, তখন একটা দমকা বাতাসের জোরেই হউক, অথবা মাস্তুলটা জীর্ণ ছিল বলিয়াই হউক, হঠাৎ মাস্তুলটা ভাঙ্গিয়া পড়িল, আর সেই নৌকাখানিও উল্টাইয়া গেল।

"বাবুদের উপরের জানালা হইতে কে "সর্ব্বনাশ হইল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বোধ হয়, নৌকায় যাঁহাদের আসিবার কথা ছিল, তাঁহাদিগকে বাবুদের বাটীর স্ত্রীলোকেরা দূর হইতে দেখিতেছিলেন। আমি তখন বাঙ্গালী পোষাকে ছিলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে গায়ের কুর্ত্তিটা খুলিয়া ফেলিলাম, তোমাদের মত মালকোঁচা মারিয়া জলে লাফাইয়া পড়িলাম।

"নৌকাটা যেখানে ডুবিয়াছিল, বায়ুর বেগে সেখান হইতে অনেকটা নিকটে আসিয়া পড়িল। নৌকাটা উপুড় হইয়া বৃহৎ তিমি মৎসের পৃষ্ঠের মত ভাসিতেছিল। আমি ডুব দিয়া নৌকার নীচে গেলাম এবং হাত বাড়াইয়া হাত বাড়াইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম; এমন সময়ে আমার মাথায় সবলে একটা মুষ্টির আঘাত লাগিল। বুঝিতে পারিলাম আরোহীরা প্রাণের জন্য ভিতরে ছটফট করিতেছে। তৎক্ষণাৎ সেই মুষ্টিবদ্ধ হাতটা ধরিয়া টানিয়া বাহিরে আনিলাম এবং নৌকার পাশ দিয়া ভাসিয়া উঠিলাম। আনিবার সময় তাহার শরীর কিসে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু সবলে টানিয়া সেই বাধা অতিক্রম করিয়া আনিয়াছিলাম। উঠিয়া দেখি একজন মাঝি নৌকার উপর চড়িয়া বসিয়াছে, আরও তিন চারজন ইতস্ততঃ সাঁতার দিতেছে। আশ্রয় প্রাপ্ত দাঁড়ীকে "পাক্‌ড়ো" বলিয়া সেই অজ্ঞান লোকটিকে নৌকার উপর তুলিতে আদেশ দিয়া আবার আমি ডুব দিলাম এবং আবার সেই প্রকারে নৌকার মধ্যে

প্রবেশ করিয়া হাত বাড়াইবামাত্র সিক্ত সুকোমল রেসমের ন্যায় একগোছা কেশ আমার হাতে ঠেকিল, আমি অমনি সেই কেশগুচ্ছ ধরিয়া বাহিরে টানিয়া আনিলাম।

"আমি তখন অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। মগ্ন আরোহীর মুষ্টির আঘাতে, আমার মাথায় বিষম ব্যথা অনুভব করিলাম। ভাসিয়া উঠিবামাত্র একজন মাঝি আমার সাহায্যার্থ আমার নিকট আসিল। আমি তাহার সাহায্যে সেই কেশ-গুচ্ছধারিণী রমণীকে লইয়া নৌকার পৃষ্ঠে উঠিলাম! মাঝি বলিল, ভিতরে আর কেহ ছিল না।

"নৌকা উল্টাইয়া পড়া হইতে এই রমণীকে উদ্ধার করা পর্য্যন্ত বোধ হয় তিন চারি মিনিট সময় লাগিয়াছিল। কেন না যখন জলমগ্ন পুরুষটিকে উদ্ধার করি, তখন সে হাত-পা ছুড়িতে ছিল, পরে নৌকার উপর উঠিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে, কিন্তু রমণীকে আমি অজ্ঞান অবস্থায় জল হইতে তুলিয়াছিলাম। নৌকাখানা ভাসিতে ভাসিতে কূলের দিকে যাইতে লাগিল। ইত্যবসরে তীরে অনেক লোকজন জমিয়া গেল, একখানা নৌকা আমাদের সাহায্যার্থ ছুটিয়া আসিল। আমি তীরে উঠিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।"

(৪)

যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম, একটি অর্দ্ধসজ্জিত কক্ষে সুন্দর কোমল বিছানার উপর আমি শায়িত। আমার মাথায় ভয়ানক ব্যথা। বক্ষেও এত বেদনা যে, নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছে। কক্ষের একপার্শ্বে একটা মৃৎপ্রদীপ জ্বলিতেছে;

আমি কোথায়, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমার নিকট একজন দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী সাহেব বসিয়া ছিলেন, তাঁহাকে পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি, কিন্তু স্মরণ করিতে পারিলাম না।

"আমাকে চাহিতে দেখিয়াই সাহেব আমার মাথার নিকট উপবিষ্ট কোনও লোককে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'Thank God, look, the patient revives, he is out of danger.'

"তাঁহার উচ্চারণ শুনিয়া বুঝিলাম, তিনি ফরাসী, ইংরাজ নহেন। অকস্মাৎ আমার মনে পড়িল, ইনি চন্দননগরের ডাক্তার মারগ্যা *।

"আমি সসম্ভ্রমে বলিলাম, 'Good evening doctor.'

"ডাক্তার ধীরে ধীরে বলিলেন, 'Good morning rather. But please keep quite. You are too weak to talk.'

"আমি তথাপি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'Where, am I ?'

"তিনি আবার বলিলেন—'Amongst your friends. But keep you quite, please.

"এই বলিয়া এক চামচ ঔষধ আমার মুখে দিলেন, বোধ হয় তীব্র সুরা। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম, ক্রমে ক্রমে বেশ বলসঞ্চার হইতে লাগিল। কক্ষান্তরে একটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া চারিটা বাজিল। একে একে আমার সমস্ত কথা

* মহাত্মা ডাক্তার মারগ্যার চেষ্টায় এবং অর্থে চন্দননগরে প্রথম দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। চন্দননগরের বর্ত্তমান সুবৃহৎ দাতব্য চিকিসালয় তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত হইয়া "মারগ্যা হাসপাতাল" নামে অভিহিত হইতেছে।

মনে পড়িয়া গেল—নৌকা মগ্ন, আরোহীদিগকে উদ্ধার ইত্যাদি আমার স্মরণপথে পড়িতে লাগিল। আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'Pray tell me, doctor, are they safe.?'

"তিনি সম্মতিসূচক মস্তকসঞ্চালন করিলেন।

"আমি আরোগ্য হইলাম। জলমগ্ন ব্যক্তির মুষ্ট্যাঘাতে আমার মাথায় বেদনা হইয়াছিল, নচেৎ আর ক্লেশ ছিল না। বলা বাহুল্য যে, আমার চিকিৎসার ব্যয় আমি দিতে চাহিলেও বাবুরা তাহা দিতে দিলেন না। তাঁহারাই সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিলেন। আমি ভাল হইলাম, কিন্তু ডাক্তারসাহেব প্রত্যহই বাবুদের বাটী আসিতে লাগিলেন। শুনিলাম, যে ব্যক্তিকে আমি প্রথমে উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাঁহার ঘাড়ে ভয়ানক আঘাত লাগিয়াছিল, তাঁহার চিকিৎসা চলিতেছে।

"নৌকা জল জলমগ্ন হইবার পর হইতে আমি বাবুদের বাড়ী প্রায়ই যাইতাম এবং পীড়িত ব্যক্তির সংবাদ লইতাম। যাঁহারা জলমগ্ন হইয়াছিলেন, শুনিলাম, তাঁহারা বাবুর জামাতা ও কন্যা। কন্যাটি দুই তিন দিনে বেশ সারিয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বামীর অবস্থা আশাপ্রদ নহে। ডাক্তারসাহেব বলিয়াছিলেন যে, সেই ঘাড়ের আঘাতের জন্যই ভাবনা। সম্ভবতঃ জলে ডুবিবার পর ছট্‌ ফট্‌ করিতে করিতে তিনি নৌকার কোনও সঙ্কীর্ণ স্থানের ভিতর গিয়া পড়িয়াছিলেন, পরে আমি যখন তাঁহাকে টানিয়া বাহির করি, তখন ঘাড় মুচ্‌ড়াইয়া গিয়া থাকিবে। শুনিয়া আমার মনে ভয়ানক কষ্ট হইল, আমি প্রাণরক্ষা করিতে গিয়া একটা

প্রাণ নষ্ট করিতে বসিয়াছি! যদি তত তাড়াতাড়ি ঝাঁপাইয়া না পড়িতাম, তাহা হইলে হয় ত দুই এক মিনিট পরে অপরের সাহায্যে জলমগ্ন নৌকা হইতে তাঁহাকে ধীরে ধীরে বাহির করিতে পারিতাম। দুই এক মিনিট জলমধ্যে থাকিলে তাঁহার প্রাণ নষ্ট হইত না। যদিও আমি শুভ উদ্দেশ্যেই তাঁহার স্কন্ধে আঘাত করিয়াছিলাম, তথাপি এক্ষণে তাহার বিপরীত ফল হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আমার অতিশয় আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। আমি কিছুতেই আমার মনকে প্রবোধ দিতে পারিলাম না।

"নৌকাডুবির পনের দিন পরে প্রাতঃকালে বাবুদের বাটীর ক্রন্দনের রোলে গগন বিদীর্ণ হইল। আমি উন্মত্তের ন্যায় তাঁহাদের বাড়িতে ছুটিলাম। শীলতা, ভদ্রতা, সামাজিকতা, সমস্ত ভুলিয়া গিয়া আমি একেবারে তাঁহাদের অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলাম। আমার মনে হইল, আমিই ঘাড় মুচ্‌ড়াইয়া বাবুদের জামাতাকে হত্যা করিয়াছি। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছি মাত্র, এমন সময়—ওঃ জগদীশ্বর! কেন গিয়াছিলাম?"

মূর্ত্তিকে নীরব হইতে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'এমন সময় কি?'

মূর্ত্তি বলিল—"এমন সময় এক অনিন্দ্যসুন্দরী অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিয়া 'কেন সাহেব আমাকে বাঁচালে?' বলিয়াই আমার পদপ্রান্তে মূর্চ্ছিতা হইয়া লুটাইয়া পড়িল। তখন সেখানে কেহ ছিল না, কিন্তু মুহূর্তমধ্যে পরিচারিকারা আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল। সেই এক দিন প্রাতঃকালে আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম,—সেই

এক দিনের এক মুহূর্ত্ত এক অনন্ত যুগ! সেই অশ্রুশূন্য নয়নের উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টি, আলুথালু বেশ, মুক্ত কেশরাশি,—তত সৌন্দর্য্য বুঝি হৃষ্টময়ীতেও থাকে না! আমি উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া তাঁহাদের বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

"সেই দিন গরুটি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলাম। সেই ঘটনার আট দশ বৎসর পরে এই রেল খুলিল। আমার পিতার একজন বন্ধু হাবড়া ষ্টেশনে আমার জন্য একটা চাকরি যোগাড় করিয়া দিলেন। আমি চাকরি করিতে লাগিলাম, কিন্তু সেই সোদ্বেগ দৃষ্টি, সেই অচঞ্চল কৃষ্ণ নয়ন এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারিলাম না।

"সেই সময় তোমাদের একজন হিন্দু সেণ্ট হিন্দু বিধবার বিবাহের জন্য খুব আন্দোলন করিতেছিলেন!"

আমি আবার বাধা দিয়া বলিলাম—"আমরা তাঁহাকে 'সেণ্ট' বলি না, আমরা তাঁহাকে পণ্ডিত ও মহাত্মা বলি।"

"এখন বল না, কিছুকাল পরে বলিবে। পরের চক্ষে জল দেখিলে যাঁহার চক্ষে অশ্রু দেখা যায়, তিনিই সেণ্ট। তোমাদের আর একজন সেণ্ট এই প্রকার হিন্দু বিধবাদিগকে অগ্নির মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সে কথা থাকুক, আমি যখন শুনিলাম যে, হিন্দু বিধবার বিবাহ হইতে পারে, এ কথা হিন্দুসমাজে গ্রাহ্য হইয়াছে, তখন আর একবার আনন্দে অধীর হইলাম। সেই বাবুকে এই শুভ সংবাদ দিবার জন্য আর একবার গরুটির দিকে ছুটিলাম। ইচ্ছা হইল তাঁহাকে গিয়া বলিব 'তোমার কন্যার বিবাহ দাও, তোমাদের সমাজ—তোমাদের ধর্ম্মপুস্তক অনুমতি দিয়াছে।' মনে

হইল, আমি যাহাকে বিধবা করিয়াছি, যদি তাহাকে আবার সধবা হইবার কোনও উপায় দেখাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে আমার আত্মগ্লানির সহস্রাংশের একাংশও কমিতে পারে। কিন্তু হায়! গিয়া যাহা শুনিলাম, তাহাতে বুক ভাঙ্গিয়া গেল, জগৎ শূন্য দেখিলাম—”

আমি বলিলাম—“গিয়া কি শুনিলে?”

“গিয়া কি শুনিলাম? শুনিলাম, স্বামীর মৃত্যুর তিন মাস পরে, হতভাগিনী হিন্দুবিধবা স্বামীর নিকট যাইবার জন্য মধ্যরাত্রিতে ছাদের উপর হইতে ভাদ্রের ভরা গাঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। তার পর আর কি বলিব? আমি চিরদিনের জন্য গরুটি ত্যাগ করিলাম। কিন্তু সে রমণী ত আমাকে ত্যাগ করিল না। সেই দিন সন্ধ্যার পর; বৈদ্যবাটী-ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছি, নিকটে কেহ নাই, এমন সময়, অদূর-বর্ত্তী জঙ্গল হইতে সে ছুটিয়া আসিয়া আমার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল,—‘সাহেব কেন আমাকে বাঁচাইলে?”

৬

“আমি উন্মত্তের মত হইলাম। দিনের বেলা বেশ কাজ কর্ম্ম করি, কোনপ্রকার গোলযোগ হয় না। কিন্তু রাত্রিতে যখন তখন সেই বিধবা আসিয়া আমার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া বলিত—‘কেন সাহেব, আমাকে বাঁচাইলে?’

“অন্যমনস্ক হইবার জন্য আমার কর্ম্মে খুব মনোনিবেশ করিলাম। তাহার ফলে চাকরিতে উন্নতি হইল, কিন্তু মনে ত শান্তি পাইলাম না। আমি গার্ড হইলাম। বিবাহ করি নাই, করিতে প্রবৃত্তিও হইল না। যখন কোনও স্ত্রীলোকের

বিষয় চিন্তা করিতাম, তখনই আলুথালু, ধুলিধূসরিত, কৃষ্ণচিক্কণ-কেশবেষ্টিত একখানি সুগৌর মুখ, অশ্রুশূন্য নয়নে অতি দীনভাবে আমার পানে চাহিয়া থাকিত, আর আমার প্রাণ হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিত। আমি যাহা বেতন পাইতাম, তাহার অতি অল্পমাত্র নিজের সেবায় ব্যয় করিয়া উদ্বৃত্ত অংশ কলিকাতায় সেই হিন্দু সেণ্টের নিকট পাঠাইতাম। শুনিয়াছিলাম, তিনি বিধবাবিবাহের জন্য নিজে অনেক অর্থব্যয় করিতেছিলেন। আমি তাঁহার নিকট টাকা পাঠাইতাম, কিন্তু তিনি কিছুই জানিতে পারিতেন না—কে পাঠাইতেছে।

"এত করিলাম, কিন্তু সেই হতভাগিনী আমাকে ছাড়িল না। রাত্রে তাহার কথা মনে পড়িলেই দেখিতে পাইতাম, কে যেন আমার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া বলিতেছে—'সাহেব, কেন আমাকে বাঁচাইলে?'

"এক দিন সন্ধ্যার সময় আমি আমার ডিউটিতে ছিলাম অর্থাৎ একখানা গাড়ীর গার্ড হইয়া বর্দ্ধমানে যাইতেছিলাম, চন্দননগর হইতে গাড়ী ছাড়িল—আমি আমার কামরায় পা-দানের উপর দাঁড়াইয়া হাতের লণ্ঠন দোলাইয়া এঞ্জিনের জমাদারকে ইঙ্গিত করিতেছিলাম। এইভাবে আলো নাড়িতে নাড়িতে কেমন যেন আত্মবিস্মৃত—বিভোর হইয়া পড়িলাম। নিবিড় অন্ধকার রাত্রি, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার, আকাশের কোলে বৃক্ষাদি যেন মিশাইয়া গিয়াছে! হঠাৎ আমার মনে হইল, ঠিক দশবৎসর পূর্ব্বে এমনি ভাদ্রমাসের বর্ষারজনীতে সেই হতভাগিনী বিধবা ছাদ হইতে গঙ্গার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। ঘটনাটা স্মরণ হইবামাত্র আমি

চমকিত হইয়া উঠিলাম—তখন গাড়ীখানা এই ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগ্‌ন্যালের কাছাকাছি আসিয়াছে—অকস্মাৎ দেখিলাম, সে এই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার পায়ে লুটাইয়া পড়িল। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, সেই কৃষ্ণ, অচঞ্চল, অশ্রুশূন্য নয়ন আমার দিকে ফিরাইল; স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, সে বলিয়া উঠিল,—'কেন সাহেব আমাকে বাঁচাইলে?'

"আমি ত্রস্তপদে যেমন পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইব, অমনি আমার পা পা-দান হইতে সরিয়া গেল, আমি লণ্ঠন দোলাইতে দোলাইতে রেলে পড়িয়া গেলাম। * * *

"সেই অবধি আমি এই খানে দাঁড়াইয়া আলো দেখাইতেছি—আমার কর্ত্তব্য আমি ভুলি নাই। কিন্তু সে ঘটনা কবে হইয়াছে, তাহা জানি না,—হয় ত লক্ষ বৎসর, লক্ষ যুগ, আবার হয় ত এই মুহূর্ত্ত। এখন আমি সময়ের পরিমাণ বুঝিতে পারি না। পূর্ব্বে যাহাকে অতীত বা ভবিষ্যৎ বলিতাম, এখন আর তাহা নাই, এখন কেবল বর্ত্তমান, কেবল সেই দৃষ্টি, কেবল সেই শব্দ,—সেই উন্মাদকারী, সেই হৃদয়-বিদারী শব্দ, 'সাহেব কেন আমাকে বাঁচাইলে?'

বলিতে বলিতে সাহেবের ছায়ামূর্ত্তি সরিয়া গেল। আমি কিছু বলিব মনে করিতেছি, এমন সময় শুনিলাম "Good night Baboo."

আমি অভিভূত হইয়া রহিলাম। একটু পরে আবার যেন অনেক দূর হইতে অতি মৃদুস্বরে কে বলিল "Good night."

আমার চলৎশক্তি নাই, স্পন্দনশক্তি নাই, আমি যেন কেমন অবশ, অসাড়, আত্মহারা, বিহ্বল হইয়া রহিলাম।

* * * *

কতক্ষণ পরে জানি না, কাহার শীতলস্পর্শে আমার চেতনা হইল। আমি সচকিতে বলিয়া উঠিলাম "Good night Mr. Gustave."

এই বলিয়া চক্ষু চাহিবামাত্র দেখিলাম, একটা শৃগাল ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বোধ হয়, আমাকে মৃত মনে করিয়া উদরপূর্ত্তির চেষ্টায় আসিয়াছিল। তাহারই শীতল-নাসাগ্র-স্পর্শে আমি জাগিয়া উঠিয়াছিলাম।

উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম, পূর্ব্বদিক্ ফরসা হইয়াছে। দেখিয়া, পুষ্করিণীর জলে মুখ ধুইয়া ধীরে ধীরে ষ্টেশনে গমন করিলাম। সৌভাগ্যের বিষয় রাত্রিতে আর বৃষ্টি হয় নাই, হইলে হয় ত বৃষ্টিতে সেই অনাবৃত ঘাটে বসিয়া ভিজিতাম।

ষ্টেশনে গিয়া আমি মেসের বাবুদের সন্ধান লইলাম। টিকিটবাবু বলিলেন যে, প্রথমে তাঁহারা আমাকে দেখিতে না পাইয়া মনে করিয়াছিলেন, আমি ভূত ধরিতে গিয়াছি; কিন্তু যখন দেখিলেন যে, ভূত আলোক নিবাইয়াছে, তখন তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সম্ভবতঃ আমি রাত্রিতে চন্দননগরে কোন আত্মীয়ের বাড়ী চলিয়া গিয়াছি। সুতরাং অন্ধকার রাত্রিতে অজ্ঞাত স্থানে আমার অনুসন্ধান করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন নাই, বিশেষতঃ বিদেশীর পক্ষে চন্দননগরের "তুড়ুম" বড় ভয়ানক। সেইজন্য তাঁহারা আর কোথাও না গিয়া, ওয়েটিং রুমে নিদ্রাদেবীর সেবা করিতেছেন।

তাঁহাদের ঘুম ভাঙ্গাইয়া আমি প্রাতের ট্রেণে কলিকাতায় ফিরিলাম।

আড়ি ও ভাব।

১

বাল্যকালে, মহাত্মা মহম্মদ মহসীনের প্রতিষ্ঠিত হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করিতাম। তখন হুগলী কলেজের সকল শ্রেণীতেই মুসলমান বালকগণ বিনাব্যয়ে পাঠ করিতে পাইত। আজকাল আর নাকি সে নিয়ম নাই।

যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নে কোনও ব্যয়ভার বহন করিতে হয় না, সেখানে ছাত্রেরও অভাব হয় না। সুতরাং হুগলী কলেজে মুসলমান ছাত্রেরও অভাব ছিল না। প্রতি শ্রেণীতেই দশ বার জন মুসলমান ছাত্র অধ্যয়ন করিত। এই সকল মুসলমান ছাত্রের মধ্যে অনেকেই দরিদ্রের সন্তান, দুই চারি জন ধনবান্ জমীদারের সন্তানও ছিল। হিন্দু বালকগণ অধিকাংশই অবস্থাপন্ন লোকের পুত্র; কেননা কলিজিয়েট স্কুলের সর্ব্ব-নিম্ন শ্রেণীতেও মাসিক আড়াই টাকা বেতন দিতে হইত। ধনশালী লোক ভিন্ন কে নিজের পুত্রকে ফার্ষ্ট বুক পড়াইবার জন্য আড়াই টাকা বেতন দিয়া কলেজে পড়াইবে? বিশেষতঃ হুগলী কলেজের অতি নিকটেই আরও দুই তিনটা স্কুল ছিল, তাহাতে নিম্ন শ্রেণীতে মাসিক চারি আনা অথবা আট আনা বেতন দিতে হইত।

আমার বয়স তখন তের বৎসর। আমি হুগলি কলেজের যে শ্রেণীতে পড়িতাম, সেই শ্রেণীতে ৮।১০ জন মুসলমান বালকও পাঠ করিত। তাহাদের সহিত আমার বেশ সদ্ভাব ছিল। এখন সকলের নাম আমার মনে নাই। আজিম্ উদ্দিন, জহুরুল্‌হক্, আলি মহম্মদ প্রভৃতি তিন চারি জনের নাম আমার মনে আছে; কারণ তাহাদের সহিত আমার বড়ই সৌহৃদ্য ছিল। হিন্দু বালকগণের মধ্যেও অনেকের সহিত আমার বন্ধুত্ব বড় গাঢ় ছিল। কিন্তু আলি মহম্মদের সহিত বুঝি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল।

আলিতে আমাতে একপ্রাণ ছিলাম। আমি তাহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতাম, তাহার মা আমাকে বেদানা, আঙ্গুর, পেস্তা, খাইতে দিতেন; আবার আলি আমাদের বাড়ীতে আসিলে, আমার মা তাহাকে সন্দেশ মিঠাই খাইতে দিতেন। আলিদের বাগানের জাম গাছে উঠিয়া সুপক্ক জম্বুফলের সদ্ব্যবহার করিয়া আমরা উভয়ে গ্রীষ্মাবকাশ যাপন করিতাম, আর আমাদের প্রাঙ্গণের পেয়ারা গাছে আমাতে আলিতে পূজার ছুটী কাটাইতাম। তখন মনে হইত, আলিকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিব না। আলির সহিত আমার বড় ভাব ছিল বলিয়াই তাহার সহিত আমার আড়িও হইত। তিন চারি দিন তাহার সহিত কথা বন্ধ করিতাম, অথচ কথা কহিবার সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতাম। কখনও এক খানা পত্র লিখিয়া তাহার অলক্ষ্যে তাহার পুস্তকমধ্যে রাখিয়া দিতাম; আবার আলিও আমার নিকট বসিবার জন্য আমাদের উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ছাত্রকে পেন্সিল্, কাগজ ঘুস দিয়া তাহাকে উঠাইয়া আমার

গায়ে গা দিয়া বসিত। তিন চারি দিন পরে যখন আড়ির বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইত, তখন যে কেবল ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত হইত তাহা নহে, সময়ে সময়ে তাহার সহিত উভয়ের অশ্রুর তরঙ্গও যোগ দিত। তখন উভয়ে আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া তিন চারি দিনের বিরহ বর্ণনায় কতই আনন্দ অনুভব করিতাম।

বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, "বাল্য প্রণয়ে অভিসম্পাত আছে।" সেই অভিসম্পাত আমাদের জীবনেও ঘটিয়াছিল। একবার আলির সহিত আমার আড়ি হইল। বালকের কলহ, কি একটা তুচ্ছ কথায় আরম্ভ হইয়া অবশেষে বেশ পাকাপাকি হইয়া দাঁড়াইল। সে আমাকে 'গরুখোর কাফের' বলিল; আমি তাহাকে 'শুয়ারখোর নেড়ে' বলিলাম। তার পর উভয়ের বাক্যালাপ বন্ধ হইল। কলহের দুই দিন পরে সংবাদ আসিল, আমার পিতা হুগলী হইতে বালেশ্বরে বদলী হইলেন। তিনি মুনসেফ ছিলেন।

বদলি ত বদলি! তখন কে জানিত যে, পিতার কর্ম্মস্থান পরিত্যাগ অর্থে চিরকালের জন্য হুগলী পরিত্যাগ? মনে মনে ভাবিলাম, হয় ত আবার দুই এক মাস পরে হুগলীতে ফিরিয়া আসিব। তখন আলির জন্য যাহা হউক এমন একটা কিছু আনিব, যাহা দেখিলে আলি চমৎকৃত হইবে। ইতোমধ্যে তাহার সহিত আর ভাব করা হইবে না।

আমাদের হুগলীত্যাগের পূর্ব্বদিন বিদ্যালয়ে গিয়া সকল সহপাঠীর নিকট বিদায় লইয়া আসিলাম। জহুরুল হক, তাজউদ্দীন, মহেন্দ্র, শশী প্রভৃতি সকলের নিকট বিদায়

লইলাম, কিন্তু আলিকে কোনও কথা বলিলাম না। তাহার সহিত কথা কহিতে, তাহাকে আলিঙ্গন করিতে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল, কিন্তু সে চাঞ্চল্য দমন করিলাম। সে আমার সহিত কথা কহিবার জন্য আমার সঙ্গে সঙ্গে অথচ কিছু দূরে বেড়াইতে লাগিল; কিন্তু তথাপি—"মরদকী বাত, হাতীকা দাঁত।"

যাইবার দিন মা বলিলেন, "মোনে (আমার নাম মোহিনীমোহন), আলি যে এ কয়দিন আমাদের বাড়ীতে বড় এল না? বিশেষতঃ আমরা হুগলী ছেড়ে যাইতেছি?" আমি বলিলাম "কি জানি?" মা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আহা! ছেলেটি বড় ভাল—তার জন্য বড় মন কেমন করিবে।" আলিদের বাড়ী যাই নাই। তাহার মাতাও আমাকে খুঁজিয়া থাকিবেন। তিনিও জানিতেন যে, আমরা বালেশ্বরে যাইব; কেন না আলির পিতা উকীল। কিন্তু আলি তাহার মাকে কি বলিয়া আমার অনুপস্থিতির কারণ দেখাইয়াছিল, তাহা জানি না।

২

বালেশ্বরে গিয়া আমার বড়ই মন খারাপ হইয়া গেল। একে সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশ, তাহার উপর আবার অজ্ঞাত-ভাষাভাষী বালকগণের সহিত অধ্যয়ন, আমাকে বড়ই চঞ্চল করিয়া তুলিল। হুগলীর সেই বাল্য বন্ধুগণের জন্য বড়ই মন কেমন করিত; বিশেষতঃ আলির জন্য। কত দিন মধ্যরাত্রে তাহার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি, পার্শ্ববর্ত্তী উপাধানকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া আপন মনে তাহাকে শত শতবার আলি

বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক হৃদয়ের উদ্বেগ কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সকলি নিষ্ফল! দিন দিন আমার শারিরীক অবস্থা মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। অবশেষে পিতা চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। হাকিমের ছেলের চিকিৎসা ভাল রকমই হইল; কিন্তু আমি ভাল হইলাম না। অবশেষে আমার পিতা অনেক চেষ্টা করিয়া মুঙ্গেরে বদলী হইলেন; ইচ্ছা, বায়ুপরিবর্ত্তনে আমার শরীর ভাল হইবে। মুঙ্গেরে গিয়া আমার শরীর অনেক ভাল হইল। মুঙ্গেরের স্কুলে পড়িতে লাগিলাম। আলিকে পত্র লিখিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু কেমন লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। তার পর এক খানা পত্র লিখিয়া তাহার নামে ডাকে দিতে যাইতেছি, এমন সময় আমার পিতা কাছারি হইতে বাসায় আসিয়া অতি বিষন্ন মনে মাকে বলিলেন, "আজ সংবাদপত্রে দেখিলাম, হুগলীর উকীল শী-মহম্মদের বসন্ত রোগে মৃত্যু হইয়াছে।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে? আলির বাপ?"

"হাঁ।"

"আহা ছেলেটার জন্য আমার এখনও মন কেমন করে; তাদের কি হবে?"

"কি আর হবে? মালদহ না জলপাইগুড়ি কোথায় তাহাদের আদি বাস; তারা দেশে চলে গেছে। তাদের অবস্থা ভাল, জমীদার।"

আমি শুনিয়া একেবারে দমিয়া গেলাম। কারণ ভবিষ্যতে যে আলিকে পত্র লিখিয়া তাহার সঙ্গে ভাব করিব, তাহারও উপায় নাই।

আমার পিতা মুঙ্গের হইতে রঙ্গপুর, চট্টগ্রাম, বাঁকুড়া ইত্যাদি কত জেলাতেই বদলী হইলেন। ইত্যবসরে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার আমার মামার বাড়ী থাকিয়া এল, এ, পড়িতে লাগিলাম। পিতার ইচ্ছা ছিল না যে আমি চাকরি করি। সেইজন্য তাঁহার ইচ্ছামত আমি এল এ, পাশ দিয়া মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইলাম। সেই সময় আমার বিবাহ হইল।

পাঠকেরা হয় ত শুনিয়া মনে মনে হাসিবেন, কিন্তু আমি এই সাত আট বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও আলিকে ভুলিতে পারি নাই। এমন কোনও দিন যায় নাই যে দিন আলিকে স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করি নাই।

যথাসময়ে আমি মেডিকেল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারী করিতে লাগিলাম। পশারও বেশ হইল। ভগবতী যখন সদয় হয়েন, তখন দশ হাতে দান করেন। মানুষ দুই হাতে কত কুড়াইবে? আমার ডাক্তারীতে বেশ দশটাকা উপার্জ্জন হইতে লাগিল। পিতার পদোন্নতি হইল; তিনি সবজজ হইলেন। আমার শ্বশুর মহাশয়ও বেশ ধনবান্ জমীদার ছিলেন। আবার আমার স্ত্রী তাঁহার একমাত্র কন্যা; সুতরাং ভবিষ্যতে আমার শ্বশুর বাটীর বিষয় পাইবারও সম্ভাবনা রহিল। এইরূপে নানা দিক্ হইতে আমাদের আয় বৃদ্ধি হওয়াতে আমাদের সংসার বেশ সুখস্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিল। আমার যথাসময়ে একটি পুত্র হইল। পিতা

তাহার নাম রাখিলেন "রমণীমোহন"। চার বৎসর পরে আমার দ্বিতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল; তাহার নাম হইল "নলিনীমোহন"।

আমি আলিকে ভুলি নাই; অনেক চেষ্টা করিয়াও কিন্তু তাহার কোনও সন্ধান পাইলাম না। আমি এখন প্রাচীন হইয়াছি। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রমণীমোহনকে বিলাত পাঠাইয়াছিলাম। সে ডাক্তার হইয়া আসিয়াছে। ছোট ছেলে নলিনীমোহন কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল। আমি ডাক্তারি এক রকম ছাড়িয়াই দিয়াছি; তবে নিতান্ত বাধ্যবাধকতা স্থলে আমাকে যাইতেই হইত। নতুবা আমার পশারটাতে রমণীমোহনকে বসাইয়া উপার্জ্জন সম্বন্ধে আমি এক প্রকার বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার শ্বশুর মহাশয় বেশ ধনবান্ জমীদার ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গালার ফরিদপুরে তাঁহার জমীদারী। আমি কখনও সে সকল জমীদারীতে যাই নাই। নলিনী-মোহন হাইকোর্টের ছুটি হইলে বৎসরে একবার করিয়া তাহার মাতামহের জমীদারীতে বেড়াইয়া আসিত।

জমীদারী রক্ষা করিতে হইলে মামলা মকর্দ্দমা এক প্রকার অনিবার্য্য। প্রজাদিগের নামে বাকি খাজনার নালিশ ত লাগিয়াই আছে, তাহার উপর আবার প্রতিবেশী জমীদার, তালুকদারদিগের সহিত মামলা মকর্দ্দমাও হইত। এই প্রকার একটা মকর্দ্দমায় আমাদিগকে বড় উৎকণ্ঠিত হইতে হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের এক ধনবতী ভূ-স্বামিনী আমাদের জমীদারীর

সংলগ্ন একটা মহল খরিদ করিয়াছিলেন। এই ভূস্বামিনী মুসলমান, তাঁহার নাম শুনিয়াছিলাম সরিফান বিবি। নূতন মহল ক্রয় করিয়াই তিনি নিজের খরিদা জমী জরিপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সূত্রে আমাদের কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার কর্ম্মচারীদের বচসা হয়। এই বচসা উপলক্ষ করিয়া সরিফান বিবির সহিত আমাদের যে কতবার ফৌজদারী ও দেওয়ানী মকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এক একটা মকর্দ্দমায় দুই তিন হাজার টাকা খরচ হইয়া যাইত। সৌভাগ্যের বিষয়, তখন জমীদারীর ভিতর কোথাও অশান্তি উপস্থিত হইলে জমীদারকে ধরিয়া টনাটানি করিবার অথবা তাঁহার নিকট হইতে মুচলেকা লইবার নিয়ম ছিল না।

একবার সরিফান বিবির সহিত একটা বড় গোছ দেওয়ানী মকর্দ্দমা বাধিয়া গেল। ফরিদপুর জেলার একটা ক্ষুদ্র নদী মনোহরপুর গ্রামের দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত হইত। গ্রামটি আমাদের সম্পত্তিভুক্ত। কালসহকারে নদীর গতি ফিরিয়া উহা গ্রামের উত্তর দিক দিয়া ঘুরিয়া মেঘনার সহিত মিলিত হইল। এক বৎসর বন্যায় মনোহরপুরের দক্ষিণ দিকের খাতটি বুজিয়া গেল। তাহার পর বৎসর সরিফান বিবি উক্ত নদীর দক্ষিণ দিকের একটা মহল ক্রয় করিলেন। তাঁহার মহলের উত্তর সীমা সেই নদী। অতএব তাঁহার কর্ম্মচারীরা মনোহরপুরকে তাঁহাদের এলাকাভুক্ত মনে করিয়া গ্রামে খাজনা আদায় করিতে আসিল। প্রজারা খাজনা না দিয়া বরং সেই কর্ম্মচারীদিগের অপমান করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। এই সূত্রে দুই একটা ছোট খাট ফৌজদারী হইয়া অবশেষে

মনোহরপুরের স্বত্ব সাব্যস্ত লইয়া দেওয়ানী মকর্দ্দমা রুজু হইল। মুনসেফি কোর্টে আমাদের হার হইল; আমরা সব-জজের নিকট আপীল করিয়া জিতিলাম। সরিফান বিবি হাইকোর্টে আপিল করিলেন। এই মকর্দ্দমা চালাইতে আমাদের প্রায় পনেরো ষোল হাজার টাকা ব্যয় হইল। অপর পক্ষের ব্যয়ের পরিমাণ বেশী হইবে ত কম নহে। কারণ আমার ছোট ছেলে হাইকোর্টের উকিল ছিল বলিয়া যে সমস্ত কার্য্য বিনাব্যয়ে সমাধা করিতে পারিত, সরিফান বিবির তাহাতে শত শত মুদ্রা ব্যয় হইত সন্দেহ নাই। তুমুল মকর্দ্দমা। উভয় পক্ষ হইতে বড় বড় ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করা হইল।

হাইকোর্টে দিনের পর দিন পড়িতে লাগিল। আমি মকর্দ্দমার দিন চোগা চাপ্কান্ আঁটিয়া মাথায় মোড়সা দিয়া হাইকোর্টে গিয়া মকর্দ্দমা দেখিতাম। আর সময়ে সময়ে বার লাইব্রেরীতে গিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতাম। এই প্রকারে দিন কাটিতে লাগিল।

একদিন অপরাহ্ণে বাটি যাইবার জন্য বার লাইব্রেরী হইতে বাহির হইতেছি, এমন সময় দেখিলাম, একজন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, প্রাচীন ঈষৎস্থূল, দীর্ঘকায় সম্ভ্রান্ত মুসলমান, অতি ত্রস্তপদে লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সহিত আমার আর একটু হইলেই একটা ধাক্কা লাগিয়াছিল আর কি! তিনি একটু অপ্রতিভ হইয়া আমাকে বলিলেন, "Beg your pardon"

আমিও দস্তুর মত "need not mention" বলিয়া চলিয়া আসিলাম। তাঁহাকে আদালতে একদিনও দেখি

নাই। তিনি লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া একজন উকীলের সহিত কথা কহিয়াই আবার ত্রস্তপদে বাহির হইয়া আসিলেন। আমি তখন প্রায় সিঁড়ির নিকট আসিয়াছি। তিনি আমার নিকট আসিয়া ইংরাজীতে বলিলেন,

"মহাশয় যদি আমার বেয়াদবি মাফ করেন তাহা হইলে আমি আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হই।"

আমি অপরিচিত ভদ্র লোকের মুখে এই কথা শুনিয়া একটু বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বলিলাম,

"আমার নামে আপনার কোনও প্রয়োজন আছে কি? আমার নাম মোহিনীমোহন"—

আমার মুখের কথা শেষ হইল না। মুসলমান ভদ্রলোকটি একেবারে ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া আমার বক্ষের উপর পড়িয়া আমাকে আলিঙ্গনে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন :—

"তুমি? মনি? আমি—আলি।"

৩

আলি? আমার সেই বাল্যসখা আলি! যাহার জন্য বাল্যে কতদিন অশ্রুবর্ষণ করিয়াছি, যৌবনে যাহার সন্ধান পাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছি, প্রৌঢ়াবস্থায় পুত্রদের নিকট যাহার উল্লেখ করিয়া শত মুখে প্রশংসা করিয়াছি, সেই আলি আজ পঞ্চাশ বৎসর পরে আমাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল! উভয়ে মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হইলাম যে, আমরা কলিকাতা হাইকোর্টের অগণ্য দর্শকের দৃষ্টি আক-

র্ষণ করিতেছি ; আমাদের প্রবীণ বয়স, সামাজিক পদ-মর্য্যাদা, জাতিভেদ, মুহূর্ত্তমধ্যে কোথায় বিলীন হইয়া গেল। তখন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রহিলাম কেবল আমি আর আলি !

মুহূর্ত্ত কি অনন্ত যুগ, জানি না ; কতক্ষণ পরে আলি আমাকে আলিঙ্গনমুক্ত করিয়া বলিল, "মনি, মনে আছে, সেই তের বৎসর বয়সে তুমি আমার সহিত আড়ি দিয়াছিলে ? আমার সহিত কথা না কহিয়া হুগলি হইতে বিদায় লইয়া আসিয়াছিলে ? আজ আমি তোমার সহিত ভাব দিলাম। বল দেখি 'ডাব'।

"ডাব" ;

"তোমার সঙ্গে আমার ভাব।"

এই বলিয়াই আলি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। আমি বিভোর হইয়া বলিলাম, "সে আজ পঞ্চাশ বৎসরের কথা।" তার পর উভয়ে কত কথা হইল। অবশেষে সে বলিল,

"এখানে কেন ?"

"একটা মকর্দ্দমার তদ্বির করিতে।"

"কি মকর্দ্দমা ? আমার জামাতা ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন। যদি প্রয়োজন হয় he will be extremely glad to be at your service।"

আমি তাহার ধন্যবাদ করিয়া সংক্ষেপে মকর্দ্দমার বিষয় বলিলাম। আলি শুনিয়া অনেকক্ষণ নিঃস্তব্ধ হইয়া অবশেষে বলিল, "মকর্দ্দমা কি প্রকার বুঝিলে ?"

"ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না ।"

"তোমার জিত হইবে।"

"কিসে জানিলে?"

"আমি ব্যারিষ্টারের শ্বশুর, এ কথাটা আর বুঝিতে পারি না?"

বলিয়া আবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "তুমি ব্যারিষ্টারের শ্বশুর, আর আমি উকিলের বাবা।" সে আবার হাসিয়া উঠিল। প্রতিবার তাহার সেই উচ্চহাস্যে সেই বালক আলির বাল্যসুলভ উচ্চহাস্যের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলাম।

উভয়ে নীচে আসিলে আলি বলিল,

"তোমার বাসা কোথায়?"

"মৃজ্জাপুরে।"

"আমার গাড়ীতে চল। ফৌজদারী বালাখানায় আমার বাটি দেখাইয়া তোমায় বাটিতে পৌঁছিয়া দিব। আমাদের বাড়িতে জাম গাছ নাই। তোমাদের বাড়িতে পেয়ারা গাছ আছে ত? একটু অপেক্ষা কর; একটা কাজ সারিয়া লই।"

এই বলিয়া আলি একজন এটর্ণির অফিসে প্রবেশ করিয়া প্রায় দশ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল "চল।" প্রকাণ্ড কৃষ্ণকায় [illegible]-বাহিত ব্রুহাম্ গাড়িতে আমরা উভয়ে উপবেশন করিলে, চালকের ইঙ্গিতে অশ্বদ্বয় নাচিতে নাচিতে আমাদিগকে লইয়া চলিল।

ফৌজদারী বালাখানার একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার দ্বারে আমাদের গাড়ি উপস্থিত হইলে, আলি গাড়ি হইতে

অবতরণ করিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া বলিল, "আইয়ে বাবু সাহেব, গরীবখানামে।"

এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া সমাদরে আহ্বান করিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া গেল। বাড়িটি নানাবিধ বহুমূল্য সজ্জায় সজ্জিত। প্রতি গৃহে বৈ... ও পাখা। হর্ম্যতলে বহুমূল্য পারস্যদেশীয় গালিচা পাতা, প্রাচীরে বড় বড় আয়না, বহুমূল্য চিত্র দেখিলেই গৃহস্বামীকে ধনবান, সৌখীন ও সুরুচি-সম্পন্ন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

মখমলমণ্ডিত স্প্রীংএর কোচে উভয়ে উপবেশন করিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,

"শুনিয়াছিলাম তোমাদের অবস্থা ভাল ছিল। এই অট্টালিকা কি তোমার পৈতৃক না স্বকৃত?"

"আমাদের অবস্থা ভাল ছিল অর্থাৎ তখনকার পক্ষে। পিতার মৃত্যুর সময় যাহা আমাদের সম্পত্তি ছিল, তাহার বার্ষিক আয় পাঁচ ছয় হাজার টাকা হইবে। আমি ব্যবসায় বাণিজ্যে সম্পত্তি অনেক বাড়াইয়াছি। আমার যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা চীনদেশেই কাটিয়া গিয়াছে। তথায় ভারতবর্ষজাত নানাবিধ দ্রব্যের ব্যবসায় করিয়া এক্ষণে পেন্সন গ্রহণ করিয়াছি। আর বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত খাটিয়া কি করিব? পুত্রসন্তান নাই। একটা মেয়ে—জামাতাকে বিলাত পাঠাইয়া ব্যারিষ্টার করিয়া দিয়াছি। তাহার এখনও তেমন পশার হয় নাই। না হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। আমার এক্ষণে বার্ষিক আয় প্রায় লক্ষ টাকা। সমস্তই তাহার হইবে; এক্ষণে তোমার সাংসারিক অবস্থা কিরূপ বল শুনি।"

"কতকটা তোমারই মত। প্রায় ৩০ বৎসর হইল পিতার মৃত্যু হইয়াছে, মাতাঠাকুরাণী এখনও জীবিত, তাঁহার বয়স আশী পার হইয়াছে। তবে চক্ষু কর্ণ বেশ সবল আছে। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করেন। আমার শ্বশুরের বিষয় সম্পত্তি এক্ষণে আমার হস্তগত হইয়াছে, তাহার বার্ষিক আয় ৫০ হাজার টাকা হইবে। বড় ছেলেকে বিলাত পাঠাইয়া ডাক্তারী পড়াইয়াছিলাম। এখন তাহার বেশ পশার হইয়াছে। আমি মেডিকেল কলেজে পড়িয়া ডাক্তারি করিতাম। এখন তোমার মত "পেন্সন" লইয়াছি। ছোট ছেলে হাইকোর্টের উকীল। দুই ছেলেতে মাসে চারি পাঁচ হাজার টাকা উপার্জ্জন করে।"

৪

সন্ধ্যার সময়ে আলির সহিত আমাদের বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। দ্বারে উপস্থিত হইয়া সহাস্যে আলিকে বলিলাম, ভাই "মুসলমানদিগের মত আমরা অত আদব কায়দায় দোরস্ত নহি; সুতরাং আমার "গরীবখানায়" তোমাকে আহ্বান না করিয়া আমাদের দেশী কথায় বলি, এই আমার বাড়ী।"

আমার বড় ছেলে বিলাতফেরৎ হইলেও আমার নিকটেই থাকিত। এ কালের ছেলেরা যেমন বিলাত হইতে আসিয়া পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া পত্নীকে লইয়া সাহেব বিবি বা ফিরিঙ্গি ফিরিঙ্গিনী সাজিয়া সাহেব পাড়ায় বাস করে আমার পুত্র সে প্রকার ছিল না। তাহার শিক্ষা দীক্ষা অন্য প্রকার ছিল। বিলাত হইতে আসিয়া সে একদিনের জন্যও সাহেব সাজে নাই। অথচ তাহার পশার প্রতিপত্তিও কম ছিল না। তবে আমাদের বাড়িটাকে সাহেবী কেতায় সজ্জিত করিয়াছিল।

তাহাতে আমি কোন আপত্তি করি নাই। আমার ধারণা, সুসভ্য পরাক্রান্ত জাতিকে এবং উপযুক্ত উপার্জ্জনসমর্থ শিক্ষিত পুত্রকে অধীনতায় রাখিতে হইলে তাহাদিগকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দান করা কর্ত্তব্য।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই আলি জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায়?"

আলিকে সঙ্গে লইয়া আমি মার নিকট গমন করিলাম। মা তখন মালা জপ শেষ করিয়া পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও পুত্রবধূগণের প্রণাম গ্রহণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমার বাটিতে নিয়ম আছে, প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যার সময়ে কনিষ্ঠগণ জ্যেষ্ঠদিগকে প্রণাম করিবে। আমার মা সকলের প্রণম্যা বলিয়া সকলেই মাকে প্রণাম করিতে যাইত। আমার সহিত অপরিচিত, পক্বকেশ, পক্বশ্মশ্রু, বৃদ্ধ মুসলমানকে অন্তঃপুরে সমাগত দেখিয়া মা একটু সঙ্কুচিত হইতেছিলেন, এমন সময়ে আলি পাদুকা বিমোচন পূর্ব্বক তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "মা, আমি আলি।"

মা অভ্যাস বশতঃ আলির মাথায় হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আলি? কোন্ আলি?"

আমি বলিলাম, "হুগলির সেই আলি মহম্মদ।"

আনন্দবিহ্বল হইয়া মা বলিয়া উঠিলেন,

"আমার সেই আলি? আহা বেঁচে থাক, বেঁচে থাক, ছেলেটি বড় ভাল, হাঁ আলি তোমার বিয়ে হয়েছে? ছেলে পিলে কি?"

মার মুখে পঁয়ষট্টি বৎসরের "ছেলেটি" আলির বিবাহ হইয়াছে কি না এই প্রশ্ন শুনিয়া আমার পৌত্র পৌত্রীর দল হাসিয়া আকুল হইল।

মা আলিকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কত কথা বলিলেন। অবশেষে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আলি রাত্রি নয়টার সময় বিদায় গ্রহণ করিল।

পরদিন আলির সহিত দেখা করিতে গেলাম; কিন্তু দেখা হইল না। তাহার কর্ম্মচারীর নিকট শুনিলাম, বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষে আলিকে হুগলি যাইতে হইয়াছে, আসিতে অপরাহ্ন হইবে। অগত্যা বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম।

অপরাহ্নে নলিনীমোহন কোর্ট হইতে আসিয়া সংবাদ দিল, "বিবি সরিফানের উকিল মকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। মনোহরপুরের সমস্ত দাবী দাওয়া তাঁহারা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত। এমন কি, আমরা ইচ্ছা করিলে মকদ্দমার খরচ পর্য্যন্ত পাইতে পারি।"

এই সংবাদে আমরা সকলেই যারপরনাই চমৎকৃত হইলাম। এই সরিফান বিবির সহিত আজ দশ এগার বৎসর কাল কত ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা হইল। আজ, এত দিনের পর অকস্মাৎ তাঁহারা একেবারে দাবী দাওয়া পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন কেন? ইহার অর্থ কি?

মা বলিলেন "আলিকে জিজ্ঞাসা কর; সে উহার ভিতরে আছে।"

চকিতের ন্যায় আমার মনে হইল, কাল আলি বলিয়াছিল, মকদ্দমায় আমরা জিতিব। তবে নিশ্চয় আলি ইহার

মধ্যে আছে। আমি কালবিলম্ব না করিয়া নলিনীকে সঙ্গে লইয়া আলির বাড়ী যাত্রা করিলাম। শুনিলাম, আলি কিছু পূর্ব্বে হুগলী হইতে প্রত্যাগত হইয়া উপরে বৈঠকখানায় বিশ্রাম করিতেছে। আমি রুদ্ধশ্বাসে তাহার কক্ষমধ্যে [illegible]শ করিয়া বলিলাম, "আলি, এ তোমার কাণ্ড। কাল [illegible] বলিয়াছিলে—আমি মোকদ্দমায় জিতিব। আজ ফলে তাহাই দাঁড়াইয়াছে। আমাকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিতে হইবে। সরিফান বিবি কে?"

আলি সহাস্যে বলিল, "সরিফান বিবি তো মেরি বেগম সাহেবা।

"সরিফান বিবি তোমার স্ত্রী? আজ দশ বার বৎসর ধরিয়া তোমার সহিত মকদ্দমায় এত টাকার শ্রাদ্ধ করিতেছিলাম; কি আশ্চর্য্য!"

"আশ্চর্য্য আবার কি? এতদিন তোমার সহিত আমার আড়ি ছিল যে ভাই। এখন ভাব হইয়াছে। সুতরাং আর মামলা মকদ্দমা হইবে কি প্রকারে? বাবাজী কি বল?" এই বলিয়া আমার পুত্রকে সম্বোধন করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল! তখন একে একে সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলাম। আমি আলির পত্নীর নাম জানিতাম না, আলিও আমার শ্বশুর, আমার স্ত্রী বা পুত্রদ্বয়ের নাম জানিত না; তাই এত দিন এই মামলা মকদ্দমা।

সমাপ্ত।